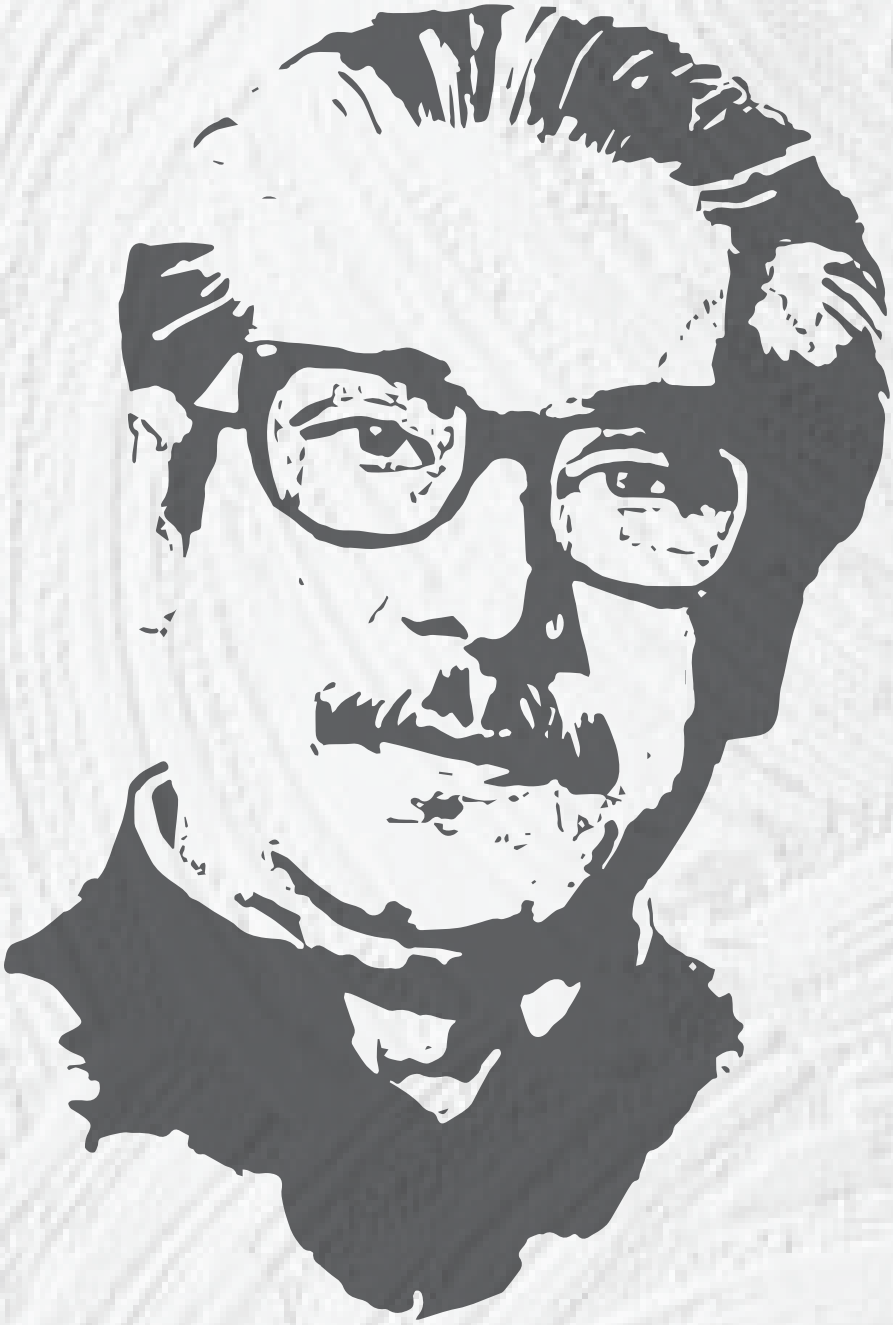

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • ডিসেম্বর ২০২০-মার্চ ২০২১

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

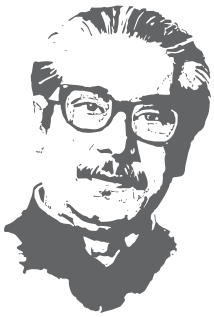

সূচি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ	২
পিতার প্রতি শ্রদ্ধা: মুজিব-বর্ষ মুজিব-স্মৃতি - আশরাফ আহমেদ	৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত	১৫
ইতিহাসের মহানায়কের সাথে কিছুক্ষণ - শাহজাহান ভুঁইয়া	২০
মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগিতা	২২
সিদীপের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৩
এসএমএপি ঋণ সহায়তায় সাফল্য - মো. জাহিদ হাসান	২৪
এসএমএপি-ঋণী কৃষকদের অংশগ্রহণ - প্রতাপ চন্দ্র রায়	২৫
একজন শিক্ষার্থী একটি খামার - ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা	২৬
একটি কাঠের চেয়ারের গল্প - আখতার জামান	২৮
চেতনার উৎস: শেখ মুজিব - সৈয়দ লুৎফর রহমান	৩১
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবিকতা - সালেহা বেগম	৩৪
কথার অমরত্ব ও স্থপতি বঙ্গবন্ধু - মাহ্‌ফুজ সালাম	৩৭
ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু - দেওয়ান মামুনূর রশিদ	৩৯
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বাগদাদি বংশোদ্ভূত জ্যাকব - রঞ্জন মল্লিক	৪১
'বঙ্গজননী': আত্মকথনের ভঙ্গিতে চমৎকার উপন্যাস - সৈকত হাবিব	৪৪
শেকড় থেকে শিখরে: ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস - আলাউল হোসেন	৪৬
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী - নোমান রবিন	৪৭

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

শিক্ষালোক

ডিসেম্বর ২০২০-মার্চ ২০২১ ● ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহানায়ক যাঁর হাতে রচিত হয়েছে বিশ্বইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় – বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কৈশোর থেকে আমৃত্যু তাঁর অনন্য সংগ্রামী জীবন বিশ্বের সকল সংগ্রামী নিপীড়িত মানুষের প্রেরণার উৎস আর আমাদের জীবনের জন্য অমূল্য পাথেয়। বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও বিজ্ঞানচেতনা-নির্ভর উন্নয়নচিন্তার উৎস হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু। তাঁর কীর্তিমান জীবনকে স্মরণ করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ সালে পালিত হচ্ছে 'মুজিব বর্ষ'।

সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যাটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক রচনা, বই-আলোচনা ও আরও কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা নিয়ে প্রকাশ করছি। বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মস্থ করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত টেকসই ভবিষ্যৎ সম্ভব নয়। তাঁর সংগ্রামী জীবন, আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা, জ্ঞানানুরাগ ইত্যাদি আমাদের জীবনে আরও চর্চিত ও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র বঙ্গবন্ধুর আলোয় আলোকিত হোক – শিক্ষালোকের এই প্রত্যাশা।

ফজলুল বারি

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : cdipbd@gmail.com, web: www.cdipbd.org

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

ভাইয়েরা আমার; আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে,

আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে, মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াাহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।

বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো,

আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে– যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধা: মুজিব-বর্ষ মুজিব-স্মৃতি

আশরাফ আহমেদ

এক

এ বছর, মানে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সেই দিন থেকে পরবর্তী দুটি বছরকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যক্তির নামের সাথে সালের প্রচলন নতুন কিছু নয়। বর্তমানে বিলুপ্ত কিন্তু চীনের প্রাচীন ঐতিহ্য থাকা ছাড়াও জাপানে নতুন রাজার অভিষেকের দিন থেকে সালটি শুরু হয় যেদিন সেই রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে অনুযায়ী জাপানে ২০২০ সালটির পরিচয় হবে নারুহিতো-বর্ষ ২। সুপরিচিত এই দুটি উদাহরণের তুলনায় 'মুজিব-বর্ষ' শুরু হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে, জাতির পিতার তিরোধানের সিকি শতাব্দী পর। কাজেই মুজিব বর্ষের প্রচলন ভিন্নতার দাবি রাখে।

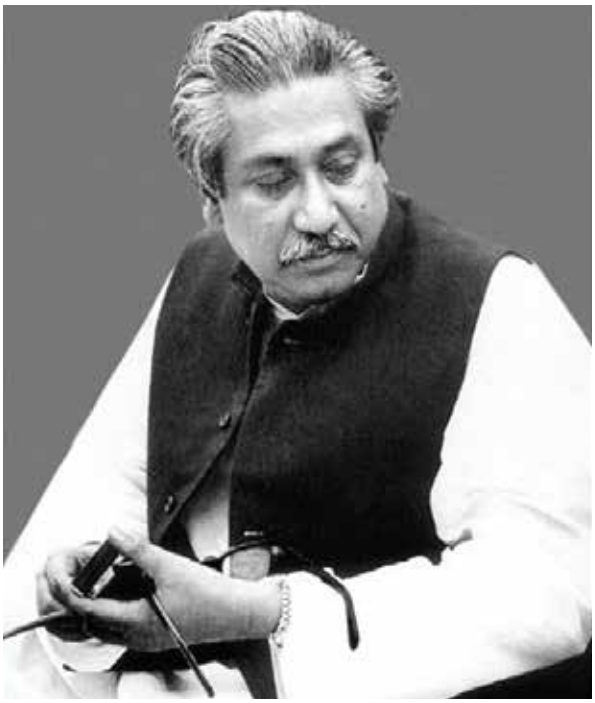

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার একাধিক প্রকাশিত লেখা রয়েছে। মাস কয়েক আগে আমার বইয়ের প্রকাশক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ফেব্রুয়ারির বইমেলায় প্রকাশযোগ্য একটি বই লিখতে পরামর্শ দিলেন। বললাম তাঁকে নিয়ে এতো লোক এতো কিছু লিখেছেন যে নতুন বইতে এসবেরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র, যা আমি করতে চাই না। তাছাড়া একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বই লেখার মতো জ্ঞান বা উল্লেখযোগ্য নতুন তথ্য আমার ভাণ্ডারে নেই। ভালো একটি গবেষণামূলক বই লিখতেও কয়েকবছর লেগে যাবে। তাই এতো অল্প সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বই লেখার পরামর্শটি তখন গ্রহণ করতে পারিনি।

কিন্তু তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীটি যতো এগিয়ে আসছিল, নিজ থেকেই কিছু লেখার তাগিদটাও তীব্র হচ্ছিল। স্মৃতির ভাণ্ডারটি আবার ঝাড়া দিলাম। যা বেরিয়ে এলো তা ঐতিহাসিক নয় মোটেই। সেগুলো নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, প্রায় সবই অপ্রকাশিত। আবার বিভিন্ন সময়ে কিছু দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে কিছু উক্তি করেছিলেন আমার কাছে। ভাবলাম নগণ্য হলেও যদি সেসব লিপিবদ্ধ করে যেতে পারি, তবে সুদূর ভবিষ্যতের কোনো নিরপেক্ষ গবেষক তাতে উপকৃত হলেও হতে পারেন।

নিচে আমার লেখাতে তাঁর চরিত্রের নতুন কোনো দিক উন্মোচিত হবে না। তবে যা লিখছি ধারণা করি অন্য কারো বয়ানে পাঠকরা এর আগে তা পড়েননি। তদুপরি তাঁর প্রত্যক্ষ ভাষণ বা বচন শুনে আমি যেভাবে উদ্বেলিত হয়েছি অন্যের ক্ষেত্রে তা না-ও হয়ে থাকতে পারে। ফলে আমার লেখাটিকে মৌলিক বলেই দাবি করছি। পুরোটা স্মৃতির ওপর ভরসা করে লিখছি বলে দিন ও তারিখের আগপিছু হয়ে থাকতে পারে তা স্বীকার করে নিচ্ছি।

দুই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়: বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৭ই মার্চ তারিখটি মনে রাখতে আমার খুব সুবিধা কারণ সেটি আমার জন্মতারিখের কাছাকাছি। কিন্তু পালন করি না বলে নিজের জন্মদিনের কথা ভুলে গেলেও ১৭ মার্চের কথা ঠিকই মনে থাকে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় আব্বার কাছে নিজের জন্মতারিখের কথা প্রথম জেনেছিলাম। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান নামটির সাথে পরিচয় হয়েছিল তারও প্রায় আড়াই বছর আগে, ১৯৬৪ সালে আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়। ঐ সময়ে আমার পত্রিকা পড়ার নেশা হয়েছে। প্রতিদিন আব্বার বন্ধু ড. আবদুর রশীদের চেম্বার-ডিস্পেন্সারিতে বসে দৈনিক ইত্তেফাক এবং পাকিস্তান অবসার্ভার পত্রিকা দুটোর আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম।

তখন রাজনৈতিক সংবাদ এবং সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামে পড়া শেখ মুজিবুর রহমান নামটির সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁকে সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য তখনো হয়নি। কিন্তু সম্ভবত পত্রিকায়ই পড়েছিলাম, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রচারণায় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর সাথে তিনি ঢাকা থেকে রেলপথে রওনা হয়েছেন। গাড়িটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে থামলে জনতার সাথে ফাতেমা জিন্নাহকে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। ভিড়ে শুধু অগণিত মানুষের মাথা দেখেই ফিরে এসেছিলাম। প্রায় প্রতিটি স্টেশনে থামতে হয়েছিল বলে সেই গাড়ি আড়াই দিন পর চট্টগ্রামে পৌঁছেছিল, পত্রিকায় পড়েছিলাম।

কিন্তু আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সেদিন বললো, আমরা ক্লাশ সেভেনে পড়ার সময় অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সালে বঙ্গবন্ধু যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছিলেন সেটি আমার মনে থাকার কথা। কারণ সময়টি না হলেও ঘটনাটি ওর মনে আছে। আমাদের অন্নদা হাইস্কুলের সামনের রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটি দালান-বাড়ির মালিক ছিলেন এডভোকেট আলী আযম ভূঁইয়া। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইয়াহিয়াদের বাসা ছিল কয়েকশ গজ দূরে, প্রায় একই রাস্তার ওপর, খুব কাছে।

একদিন দেখা গেল খুব লম্বা মত এক ব্যক্তির পেছনে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক আলী আযম সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্লোগান দিতে দিতে লোকনাথ দিঘির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলের মাঠে খেলতে থাকা গুটিকয় বন্ধুর সাথে ইয়াহিয়াও তাঁদের পিছু নিল। দিঘির সামনে বিশাল মাঠের এককোণে ছিল এক কড়ই গাছ। সেখানে কয়েকটি চেয়ারসহ একটি টেবিল পাতা, এবং দর্শক-শ্রোতার সারিতে গোটা বিশেক চেয়ার পাতা ছিল। আলী আযম ভূঁইয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমান দুটি চেয়ারে বসলেন, এবং বঙ্গবন্ধু শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। শ্রোতার সংখ্যা এক-দেড়শতের বেশি ছিল না। এই সমাবেশের বেশ দূরে, মাঠের প্রায় অন্যপাশে আরেকটি ছোট গাছের নিচে টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে দুই ব্যক্তি বসেছিলেন। তারা ছিলেন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তখনকার প্রথা অনুযায়ী বিরোধী দলের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধকারী।

একই স্কুলের ছাত্র হলেও ঘটনাটি আমার একেবারেই মনে নেই। সম্ভবত সেটি ছুটির কোনো দিন ছিল বলে আমার স্কুলে যাওয়া হয়নি। অথবা রাজনীতি নিয়ে তখনো আমার আগ্রহ জন্মায়নি। ফলে সেদিন বঙ্গবন্ধুকেও দেখা হয়নি।

তিন

ছয়দফা: এর মাঝে '৬৫র সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেল। বিমান আক্রমণের ভয়ে আমরা বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে মাটি খুঁড়ে পরিখা বানালাম। আত্মরক্ষার জন্য নিষ্প্রদীপ মহড়া দিলাম। ভয়ে ভয়ে রইলাম কখন ভারতীয় সেনারা আক্রমণ করে বসে। প্রায় একই সময়ে পত্রপত্রিকায় এবং স্কুলে ও পাড়ায় ক্ষোভের সাথে আলোচনা শুনতে পেলাম পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ আমাদের বাসস্থান পূর্ব পাকিস্তানকে নিরাপদ রাখার মত পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি পাকিস্তানের নেই।

একসময় খবরে পড়লাম এই সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরের এক সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। বাঙালিদের মাঝে রাতারাতি এই ছয় দফা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ছয়টি দফা কী তা না জেনেও স্কুলের বন্ধুরা পক্ষ ও বিপক্ষ নিয়ে তুমুল বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তো।

ছেষট্টির মার্চে দুজনের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে মামাতো ভাই খসরুর সাথে ময়মনসিংহে ওর বড়বোন ফেরদৌসি আপার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। সেখানে দুলাভাইয়ের এক ভাগ্নির বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে পরিচয় হলো তাঁর ভাগ্নিজামাইর (নামটি ভুলে গেছি) সাথে, পেশায় কন্ট্রাক্টার। দেখেই মনে হলো বহুবার পত্রিকায় দেখা ছবির শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হলে আমি ছয় দফার পক্ষে তর্ক করলাম। পরীক্ষা করার জন্যই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ছয়টি দফা কী, তা বলতে পারবে? আমি গড়গড় করে সব বলে গেলাম। তিনি প্রীত হলেন। শুনলাম তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং শেখ মুজিবের একজন প্রিয়পাত্র। এই ব্যক্তি সত্তরের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে বাসা হওয়ায় একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতেই পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হন। এবং মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে পাকিস্তানিদের শিখিয়ে দেয়া বিবৃতি দিয়ে ধিক্কৃত হয়েছিলেন।

ময়মনসিংহ বেড়ানো শেষ হলে আমি কুমিল্লায় যাই। খালার বাড়িতে বেড়িয়ে যাই ফুপুর বাড়িতে। সেদিন সাতই জুন, ছয় দফা দাবি আদায়ে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতাল। ফুপু তার ছেলেদের এবং আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন বাড়ি থেকে না বেরোই, গণ্ডগোল হতে পারে। বন্দুকের কয়েকটি শব্দ শুনে ছাদে উঠে আমি ও তৌফিক ভাই জনমানবহীন রাস্তা ও শহরের দিকে তাকিয়ে থাকি। দূরে জজ কোর্ট প্রাঙ্গণে একটি পুলিশবেষ্টিত জিপগাড়ি ছাড়া আর কিছু নজরে পড়লো না। পরদিনের পত্রিকায় পড়লাম হরতালের সময় ঢাকায় পুলিশের গুলিতে সাতজন নিহত হয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছেন।

এর পরের কয়েকদিনের খবর ছিল ঢাকার আদালত শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু তিনি নারায়ণগঞ্জে গ্রেফতার হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন কিন্তু বরিশালে গ্রেফতার হয়েছেন। বরিশালের বিচারক মুক্তি দিয়েছেন কিন্তু খুলনায় গ্রেফতার হয়েছেন। এভাবে তাঁর গ্রেফতার হওয়া ও মুক্তি পাওয়ার ঘটনাগুলো শেখ মুজিবুর রহমান নামটিকে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সমার্থক করে তুললো। অবশেষে তিনি মুক্ত হলেন বেশ কিছুদিনের জন্য।

আপাকে নিয়ে আমি ঢাকায় এসেছি তাঁর মোহাম্মদপুরের বাসায়। অপেক্ষা করছি আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোনোর। একদিন 'দৈনিক পাকিস্তান' অথবা 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় দুটি ছবিসহ খবর পড়লাম। একটি ছবিতে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নবাবপুর রোডে প্লেকার্ড হাতে শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে লেখা 'আমরা বাঙালি, ভুট্টা খাই না।' পরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে (পুলিশের ছিনিয়ে নেয়া) প্লেকার্ডটি মাটিতে পড়ে আছে, কিন্তু লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে।

আগের বছরের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এবং পরে ভারতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। পরের বছর তা পূর্ব পাকিস্তানেও দেখা দেয়। তা মোকাবেলা করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ভাত খাওয়ায় অভ্যস্ত বাঙালিকে ভুট্টা খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান এরই প্রতিবাদ করছিলেন।

এক সময় তাঁকে কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী হিসেবে গ্রেফতার করা হলো।

চার

শেখ মুজিবের মুক্তি চাই: আমি ঢাকা কলেজে ঢোকার কিছুদিনের মাঝেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। তখন শুধু শ্রেণি প্রতিনিধিই নির্বাচন করা হতো সেই শ্রেণির ছাত্রদের ভোটে। বন্ধুদের মাঝে ছাত্রলীগের অনুসারী বেশি হলেও ছাত্র ইউনিয়নের অনুগতদের সংখ্যাও কম নয়। তখন শুনতাম, ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা সব সময়ই ভালো ছাত্র হয়ে থাকে। ছাত্রলীগে তেমন নয়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু নিঃস্বার্থ হন। ছাত্রলীগের ক্ষেত্রে প্রায়ই তা নয়। নিজেকে স্বার্থপর ভাবতে চাইতাম না। তাই আমি ছাত্র ইউনিয়নেই যোগ দিলাম। কিন্তু ছাত্রলীগের সাথে বৈরিতা অনুভব করিনি।

কলেজের নির্বাচনে আমার সমর্থিত ছাত্র ইউনিয়নের মাহবুব জামান আমার ছাত্রলীগের বন্ধু নিজামউদ্দিন ফারুকের কাছে হেরে গেল। পরবর্তীতে যুদ্ধদিনের অনেকটা সময় আমি নিজামউদ্দিনের সাথে কাটিয়েছি। মূলত শেখ মুজিবের ছয় দফার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে সারা কলেজে ছাত্রলীগ বিজয়ী হলো। পরের বছরের কলেজ নির্বাচনেও গতবারেরই পুনরাবৃত্তি হলো, অর্থাৎ ছাত্রলীগেরই জয় হলো। সেবার আমার এক বছর নিচে প্রথম বর্ষের ছাত্র, শেখ মুজিব তনয় শেখ কামালও বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল। সেদিনই শুনেছিলাম ওর বড়বোন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইডেন কলেজের নির্বাচনেও বিজয়ী হয়েছিলেন। সেটি ছিল ১৯৬৭ সাল।

আমাদের আলোচনার মাঝে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালিদের শোষণের, বঞ্চনার কথাই বেশি উঠে আসতো।

কলেজ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি ১৯৬৮ সালে। আগস্ট মাসে ক্লাশ শুরুর এক সপ্তাহের মাঝে আইয়ুব সরকারপন্থী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (সংক্ষেপে এনএসএফ) দুর্ধর্ষ পাণ্ডাকে হত্যা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ডিসেম্বরে আবার ক্লাশ শুরুর প্রায় সাথে সাথে ১৭ই ডিসেম্বর কলাভবনের সামনে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ দিয়ে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়।

জানুয়ারির ২০ বা ২১ তারিখ ছাত্রদের বিশাল মিছিলটি কলাভবন থেকে নিউমার্কেট-আজিমপুরের দিকে যাচ্ছিল। আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম নীলক্ষেতে ফুটপাতে। মিছিল থেকে আসা গগনবিদারি স্লোগান শুনে আমার রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠলো। কামানের গোলার মত প্রচণ্ড গতিতে আমি মিছিলে মিশে গিয়ে সামনের দিকে চলে এলাম। যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম ততক্ষণে আমার দেয়া স্লোগানের সাথে সাথে পেছনের হাজার হাজার ছাত্র প্রতিধ্বনি করে চলেছে।

ছয় দফা এগারো দফা, মানতে হবে
মানতে হবে।
আইয়ুব শাহী আইয়ুব শাহী, নিপাত
যাক, নিপাত যাক।
হারামজাদা হারামজাদা, নাসরুল্লাহ
নওয়াবজাদা।
আইয়ুব-মোনায়েম দুই ভাই, এক
দড়িতে ফাঁসি চাই।
শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।

শেখ মুজিব মুক্ত হন কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আমাদের মুখের স্লোগান শুধরে দেন। আমাদের নতুন স্লোগান হয়,

নির্বাচন নির্বাচন, মানি না মানি না।
ব্যালটে না বুলেটে, বুলেটে বুলেটে।
জোতদারের গোলাতে,
আগুন জ্বালো একসাথে।

স্লোগান দেই ঠিকই, খুব জোরে। কণ্ঠনালীকে ক্ষতবিক্ষত করে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরাই, মাতম করতে করতে শিয়া ধর্মাবলম্বীরা বুক থেকে যেভাবে ঝরায়। আমাদের রক্ত দেখে কেউ ভয় পায় না কিন্তু আগুন ও বুলেটের কথা যেই শোনে, সেই ভয় পায়। শাহবাজপুরে মেঝমামার ধানের গোলা ও পাটের গুদাম আছে জানি, কিন্তু তাঁকে তো কেউ জোতদার বলে না! তিনি কৃষক বা গ্রামবাসীদের অত্যাচারও করেন না।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের স্লোগান:

পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা।
পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার
ঠিকানা।
তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ
বাংলাদেশ।

মানুষ খুব সহজেই গ্রহণ করে ফেলে। বড়রা তো বটেই খেলার ছলে ছোট ছোট শিশুরাও এইসব স্লোগান দিয়ে যায়। ঊনসত্তরের সেই গণআন্দোলনকে পুঁজি করে জহির রায়হান 'জীবন থেকে নেয়া' নামে একটি সিনেমা বানিয়ে ফেললেন। যদিও সিনেমাটি এগারো দফা এবং

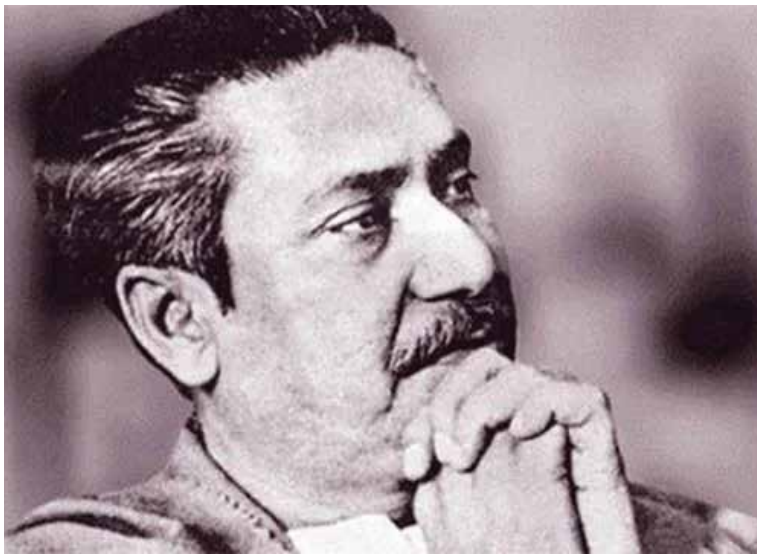

মেহনতি জনতার গান-স্লোগানে ভরা ছিল, হত্যাচেষ্টা মামলা ও তার ফলাফলকে দর্শকরা খুব সহজেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রূপক হিসেবে দেখলো। সিনেমাটির জনপ্রিয়তা তাই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল।

ভাঙাভাঙির অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আনুষ্ঠানিক ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে আমি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অনার্স পরীক্ষার বাকি আর এক বছর মাত্র। কিন্তু নির্বাচনের আগে ও পরে ঢাকায় শেখ মুজিবের কোনো জনসভায় যাওয়ার তাগিদও এড়াতে পারতাম না। তিনি যেন আমার মনের কথাই বলেন। আমার বাম রাজনীতির প্রতি মোহে আরো ভাটা পড়ে।

ফলে ঊনসত্তরের ১৫ই মার্চ, একাত্তরের ২০শে জানুয়ারি, ৩রা ও ৭ই মার্চ, এবং বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর অনেক সভাতেই উপস্থিত থেকেছি।

[এটি এবং নিচের লেখাটির কিছু অংশ ২০১৮ সালে প্রকাশিত আমার 'পাণ্ডুলিপির একাত্তর' বই থেকে নেয়া।]

পাঁচ

জনসভা: আগে যেমন লিখেছি, আমি ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের একজন সক্রিয় সৈনিক ছিলাম। এই আন্দোলনের ফলে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল করলে সেই বছরের ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে সরাসরি জনসভায় এসেছিলেন। ফজলুল হক হল থেকে দল বেঁধে বন্ধুদের সাথে আমি গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে রমনা রেসকোর্সে সেটিই ছিল প্রথম রাজনৈতিক জনসভা। সম্ভবত তখন থেকেই রেসকোর্সটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিতি লাভ করে। এর আগে জনসভাগুলো হতো ঢাকা স্টেডিয়ামের মাঠে। ফেস্টুন ও ব্যানার হাতে বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে আসা ছাত্রজনতার ভিড় ছিল অভূতপূর্ব। বসেছিলাম মঞ্চ থেকে অনেক দূরে, ঘাসের ওপর। প্রায় দশজন ছাত্রনেতার ভাষণ শুনতে শুনতে অনেক অপেক্ষার পর শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে এলেন। এই প্রথম আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম। বক্তৃতায় তিনি কী বলেছিলেন তার কিছুই মনে নেই। যা মনে আছে তা হচ্ছে সেই জনসভায় তুমুল হর্ষধ্বনি এবং করতালির মাঝে ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

একাত্তরের ২০শে জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনোত্তর জনসভা হয়। ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ না করলেও আমি সেই সভাতে উপস্থিত ছিলাম। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সভায় নৌকার আকারে প্রস্তুত বিশাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের দলের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করান। বক্তৃতায় জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, এই নির্বাচিত সদস্যদের কেউ বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে 'জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'এমন কী, আমাকেও।' নিজ সম্পর্কে এমন কথা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করতে পারেন, তাঁকে কি শ্রদ্ধা না করে থাকা যায়?

একাত্তরের মার্চের এক তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে আমরা নিশ্চিত হই যে স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। ফলে সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য সেদিন থেকেই ফজলুল হক হলে বন্ধুদের সাথে গোপনে আমি বোমা বানানোতে সচেষ্ট হই। (পরবর্তী সাত দিনের আমাদের সেই কর্মকাণ্ডের কথা আমি 'ফজলুল হক হলের সূর্যসেন স্কোয়াড' নামে এক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি।) আমাদের প্রবল ইচ্ছা বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। মার্চের সাত তারিখ দল বেঁধে আবার যাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর ভাষণ শুনতে। না, তিনি আমাদের নিরাশ করেননি। ঘোষণা করলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এসেছেন। ঘোষণা করা হয়েছে বিমান বন্দর থেকে তিনি সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় উপস্থিত হবেন। আমি তখন থাকি সিদ্ধেশ্বরিতে আমার বড় আপার বাসায়। সকাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক সরকার ফিরোজউদ্দিন বিমানবন্দরের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখা গেল রাজহংসের মতো সাদা ধবধবে এক বিমান থেকে বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এসেছেন।

নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভেঙে মন্ত্রীপরিষদের আগে ছাত্রনেতারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন।

এভাবে প্রাণপ্রিয় নেতাকে বরণ করার বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাণির মতো আমিও উদগ্রীব হয়ে আছি। তাই টেলিভিশন দেখা বন্ধ রেখে সাথে সাথে দৌড়ে ছুটলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে। প্রচণ্ড ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে জনতার প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছি। অপেক্ষা করছি তো করছি, কিন্তু নেতার দেখা নেই। এক সময় বিমান বন্দরের দিকে দূর থেকে আকাশে ছোট্ট একটি হেলিকপ্টার দেখা গেল। তাতে বঙ্গবন্ধু আসছেন ভেবে জনতার সাথে হর্ষধ্বনি করে উঠলাম। খুব ছোট হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে একটি লাল চাদর বাতাসে উড়ছে। সেই চাদরের মালিক বাংলাদেশ টেলিভিশনের অতি পরিচিত অনুষ্ঠান ঘোষিকা মাসুমা খাতুনকে আমার চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি মোটেই। বোঝা গেল এই হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধু নেই, কারণ বাংলাদেশ সরকারের কোনো পরিচিত মুখ সেখানে ছিল না।

অনেক আপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী খোলা গাড়িটি জনসভায় প্রবেশ করলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। দর্শক শ্রোতাদের কেউ হর্ষধ্বনি করছে, কেউ হাউমাউ করে কাঁদছে, কেউ নীরবে চোখের জল মুছছে। অনেক দূর থেকে হলেও মঞ্চে উঠে আসা বঙ্গবন্ধুর মুখটি ঠিকই দেখতে পেলাম। মনে হলো তিনি অনেক শুকিয়ে গেছেন! আমার সারা দেহে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভালোবাসার এক শিহরণ বয়ে গেল। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বললেন, পাকিস্তানে বন্ধ কারাকক্ষের বাইরে তাঁর জন্য কবর খোদা হয়েছিল। এই শুনে আমার পাশে বসা এক বৃদ্ধ হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল, আর বারবার গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মুছছিল। বৃদ্ধের অশ্রু আমার চোখেও ছোঁয়াচে হয়ে দেখা দিল।

মনে পড়লো প্রায় এক বছর পূর্বে এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন কেউ বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে 'জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।' একটু থেমে বলেছিলেন, 'এমন কী, আমাকেও।'

না, বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করেননি, পাকিস্তানিরা তাঁকে খুঁড়ে রাখা কবরে পুঁতেও ফেলেনি। তাঁকে হত্যা করে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালিই!

ছয়

বঙ্গভবনে: ১৯৭৩ সালে আমি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পৃক্ততা থাকলেও এখন পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। হলের বন্ধুদের বেশির ভাগই ছাত্রলীগের। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগে তখনো আনুষ্ঠানিক বিভক্তি না হলেও দুটি ধারা অতি স্পষ্ট। ডাকসু নির্বাচনের সময় আসম রবপন্থী উপদলটি ফজলুল হক হলের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের একটি উপদলের সাথে আঁতাত করে বিজয়ী হয়। আমাদের হলে এই উপদলের দুই নেতা ফিজিক্সের হাবিবুল্লাহ ভাই এবং বায়োকেমিস্ট্রির আমিন ভাই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে নির্বাচনে বিজয়ী দলটির মিছিলে তাঁদের উৎসাহে যোগ দিয়ে বেইলি রোডের কোণে বঙ্গভবনে গিয়েছিলাম। সংখ্যা মনে নেই, তবে আরো দুয়েকটি হলের বিজয়ীসহ আমাদের দলে সম্ভবত অনধিক একশত জন ছাত্র ছিল।

বঙ্গভবনের বিশাল বারান্দায় গোল হয়ে আমরা মেঝেতে বসেছিলাম। বঙ্গবন্ধু বসেছিলেন একটি চেয়ারে। তাঁকে ঘিরে এবং গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা। সম্ভবত আসম আবদুর রবই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর গায়ে লেগে থাকা নিকটতম ব্যক্তি। চেহারায় একটি শান্ত ভাব বজায় রেখে বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের কথা শুনছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি কী বলেছিলেন তা মনে নেই। তবে বিজয়ীদের অভিনন্দন যে জানিয়েছিলেন সে কথা আমার মনে আছে। আরো মনে আছে তাঁর মুখে বা অভিব্যক্তিতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

তা সত্ত্বেও ফিরে এসে আমিন ভাই হলের দোতলার পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছিলেন, দেখলে তো বঙ্গবন্ধু আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানানোর মানে কি বোঝো? আভিনন্দন জানানোর মানে বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে আছেন!

সাত

খেলার মাঠে: ১৯৭২ বা ৭৩ সালের কোনো এক সময়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব হবে। বঙ্গবন্ধু সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাজানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের মাঝে মঞ্চ বানানো হচ্ছে। এদিকে সেদিকে মোটা মোটা বাঁশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি শুধু উৎসব নয়, এটি ভাবগম্ভীর একটি পবিত্র অনুষ্ঠানও বটে। বঙ্গবন্ধু সেটি জানেন। কাজেই মূল অনুষ্ঠানটি যেন ত্রুটিহীন হয় তা নিশ্চিন্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু আজ স্টেজ রিহার্সেলে এসেছেন।

কী কারণে আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বঙ্গবন্ধু আসছেন বা এসেছেন শুনে মাঠের ভেতরে ঢুকলাম। একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং জাতীয় ছাত্রনেতা পরিবেষ্টিত হয়ে নির্মীয়মান মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উৎসাহী দর্শক হিসেবে কিছু ছাত্রজনতার কাতারে দূর থেকে আমি তা দেখছি।

হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হয়ে একদল ছাত্র মিছিল করে মঞ্চের সামনে চলে এলো। সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম কর' স্লোগান দিতে লাগলো। বঙ্গবন্ধুর পাশে মঞ্চের উপরে দাঁড়ানো ডাকসুর ভিপি আবদুল কুদ্দুস মাখন মাইক্রোফোনটি হাতে নিলেন। ধমকানোর সুরে তিনি বললেন, মাহবুব, এই মাহবুব, চুপ করো। সরো এখান থেকে, সরো এখান থেকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! কোনো কথা না বলে বঙ্গবন্ধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। দুদিন পরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের যে পবিত্রতা রক্ষা করতে তিনি এসেছেন, পুত্রতুল্য ছাত্রদের সাথে বাদানুবাদ করে আগেই তিনি তা ম্লান করে দিতে চাননি। ফলে শুধু স্লোগান দেয়া ও শোনা ছাড়া কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘটেনি।

আট

গণভবনে: আমার খালাত নোমান ভাইয়ের নাম এইচ আই আলমগীর। আমার এবং আমাদের পরিবারের অতি আপনজন। আমার সাথে বয়সের পার্থক্য ৪/৫ বছর হলেও সম্পর্কটি ছিল বন্ধুর মতো, এখনো তাই আছে। সবসময় মুখে লেগে থাকা দুষ্টুমির হাসি কিন্তু সরলতা এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ব্যক্তিত্বের জন্য খুব সহজেই মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৯৭১ সালের মার্চে তেমনি এক নাটকীয় পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। নিয়োগ পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে, এবং বিলাত থেকে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন। তখনকার যে কয়টি আইকনিক ছবি বেঁচে আছে, তার একটিতে চোঙ্গা-মাইক হাতে নোমান ভাইকে বঙ্গবন্ধুর সামনে দাঁড়ানো দেখা যায়। নিরাপত্তারক্ষী হলেও একা বিশ্রাম নেয়ার সময় কখনো কখনো চেয়ারে বসে থাকা বঙ্গবন্ধুর মাথা টিপে দিতেন তিনি।

একদিন নোমান ভাইকে বললাম, গণভবনে যেতে চাই এবং একই সাথে বঙ্গবন্ধুকেও সামনাসামনি দেখতে চাই। তিনি বললেন, পারমিশন নিতে গেলে ঝামেলা হবে। তার চাইতে তুমি একদিন আমার সাথে গণভবনে চল। লিডার এলে তাঁকে কাছ থেকে দেখতে পাবে। নোমান ভাইয়ের কথামতো তাই করলাম এক সন্ধ্যায়। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অধস্তনরা লিডার বলেই সম্বোধন করতেন। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাসায় বৈকালিক বিশ্রাম শেষে বঙ্গবন্ধু তখনো গণভবনে এসে পৌঁছাননি।

অনেক দূর থেকে হলেও মঞ্চে উঠে আসা বঙ্গবন্ধুর মুখটি ঠিকই দেখতে পেলাম। মনে হলো তিনি অনেক শুকিয়ে গেছেন! আমার সারা দেহে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভালোবাসার এক শিহরণ বয়ে গেল। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বললেন, পাকিস্তানে বন্ধ কারাকক্ষের বাইরে তাঁর জন্য কবর খোদা হয়েছিল। এই শুনে আমার পাশে বসা এক বৃদ্ধ হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল, আর বারবার গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মুছছিল। বৃদ্ধের অশ্রু আমার চোখেও ছোঁয়াচে হয়ে দেখা দিল।

গণভবনের ঘরগুলোর পারস্পরিক বিন্যাসের কথা এখন ভালো মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে নোমান ভাইয়ের জন্য বরাদ্দ নিরাপত্তা অফিস ঘরটি ছিল দালানের বাঁ দিকে এক কোণে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি থেকে কয়েক কদম বামে। এই ঘরটি পেরিয়ে ভেতরের ঘরটি ছিল নোমান ভাইয়ের ঊর্ধ্বতন, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলের প্রধান, বিশালদেহী মহীউদ্দিন সাহেবের। নোমান ভাই আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, তুমি এই ঘর থেকে বেরোবে না, বিশেষ করে লিডার যখন এসে পৌঁছান। লিডার যে কোনো সময় এসে পড়বেন। দরজাটি খোলা থাকলো। এখান থেকেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।

এমন সময় মহীউদ্দিন সাহেব এসে ঢুকলেন। গলায় টাইসহ পরনে চকচকে একটি স্যুট। হাসিমুখে নোমান ভাই জিজ্ঞেস করলেন, সুন্দর একখান স্যুট পরেছেন স্যার, নতুন বানালেন নাকি? মহীউদ্দিন সাহেবও গর্বিতভাবে বললেন, হ্যাঁ আজই কিছুক্ষণ আগে ডেলিভারি নিয়েছি, কেমন হয়েছে বলতো? নোমান ভাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই বললেন, খুব সুন্দর স্যার।

এর মাঝেই বাড়িতে উপস্থিত লোকজনের চলাফেরায় বেশ কর্মচাঞ্চল্য দেখা গেল। তাঁরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে নোমান ভাই আমাকে সাবধান করে গেলেন আমি যেন কোনোমতেই ঘর থেকে না বেরোই। খানিকক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম বঙ্গবন্ধুর গাড়িটি গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম মহীউদ্দিন সাহেব এবং নোমান ভাই পরিবেষ্টিত হয়ে বঙ্গবন্ধু সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। টেলিভিশনে অনেকবার দেখা অতি পরিচিত সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও মুজিব কোট গায়ে এই তো আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। এই সেই ব্যক্তি যার অঙ্গুলি হেলনে একটি ঘুমন্ত জাতি জেগে উঠেছে। সারা দেহে একটি শিহরণ অনুভব করলাম।

মহীউদ্দিন সাবেবের দিকে তাকিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভ্রু কুঁচকে উঠলো। কণ্ঠে তিরস্কার মেখে বলে উঠলেন, নূতন স্যুট পরে এসেছো? টাকা কোথায় পেয়েছো? তোমরা একেক দিন একেক স্যুট পরে আসবে তো লোকজন আমাকে চোর বলবে না কেন? খবরদার এসব পোষাক পরে আমার সামনে আর আসবে না।

সবচেয়ে পেছনে থাকা নোমান ভাই সর্বদা মুখে লেগে থাকা তাঁর স্বভাবজাত হাসিটি নিয়ে নিজ অফিসে ফিরে এসে কী বলতে বলতে আমার সামনে দাঁড়ালেন। বলতে লাগলেন, আমি তখনই ভেবেছিলাম লিডার তাঁর স্যুট পরাটা পছন্দ করবেন না।

পরক্ষণেই ভীষণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মহীউদ্দিন সাহেব গলার টাইটি টেনে খুলতে খুলতে নোমান ভাইয়ের ঘরে এসে ঢুকে বলতে লাগলেন, লিডার খুব চটে গেছেন, তাই না? আমি একদম বুঝতে পারিনি। শুধু টাই নয়, প্রচণ্ড গতিতে পরনের কোটটিও খুলে ফেলে মনে হলো ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে নিজের ঘরে ঢুকে তিনি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

নয়

দিল্লী ও ভুট্টো: ১৯৭২ থেকে '৭৪ সালের মাঝে নোমান ভাইয়ের মুখে শোনা এবং স্মৃতিতে গেঁথে থাকা ঘটনা:

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে নিয়ে। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে একান্ত বৈঠকও করেন। ভুট্টো তখনো ঢাকা ত্যাগ করেননি। নোমান ভাই আগের মতোই তাঁর মাথা টিপে দেয়ার সময় বঙ্গবন্ধু নোমান ভাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটি স্বগতোক্তি করছিলেন। তা ছিল এইরকম। ভুট্টো আমাকে (মওলানা ভাসানী সম্পর্কে) বলে 'শেখ সাহাব, উস বুড্ডহাকো আভি তক যিন্দা রাকখা কিউ? (ঐ বুড়াকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন কেন?) খতম কার দেতে নাহি কিউ?' (শেষ করে দিচ্ছেন না কেন?) আমি বলেছি, ভুট্টো সাহেব, বাংলাদেশে আপনাদের সেনাবাহিনী দিয়ে যথেষ্ট খুনখারাপি করিয়েছেন। আপনি নিজ দেশে গিয়ে আরো যত খুশি খুনখারাপি করুন, কিন্তু আমাকে এ ধরনের উপদেশ দিতে আসবেন না।

দশ

দৃঢ়চেতা বঙ্গবন্ধু: ফুপাত ভাই হলেও বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিব জনাব গোলাম কিবরিয়ার সাথে আমার পরিচয় আমেরিকা আসার পরপর, ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৩-৮৬ কালে তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের বিকল্প পরিচালক বা অলটারনেট ডাইরেক্টার ছিলেন। সেই সময় তিনি আমাকে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতার পর কোনো একসময় বিশ্বব্যাংকের সভাপতি রবার্ট ম্যাকনামারা গণভবনে এলেন। ঋণ দেয়ার শর্ত হিসেবে নতুন দেশটির ওপর পাকিস্তানি আমলে প্রাপ্ত কিন্তু যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্পের ঋণের বোঝা চাপাতে চাইলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন সভাপতি সাহেব, সেগুলো আমার কাছে দুমড়ানো মোচড়ানো লৌহপিণ্ড (স্ক্র্যাপ আয়রন) ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যদি মেরামত করে প্রকল্পগুলো চালু করে দিতে পারেন, তবেই সেই ঋণের বোঝা আমি নেব। অন্যথায় নয়।

ম্যাকনামারা বললেন, তাহলে তো আমরা নতুন কোনো ঋণ দিতে পারবো না! বঙ্গবন্ধু বললেন, তবে তো কিছু করার নেই। ম্যাকনামারা বললেন, তাহলে আপনার লোকজন খাবে কী?

গম্ভীর মুখে বঙ্গবন্ধু সোফা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে জানালার কাছে গেলেন। পর্দা সরিয়ে বাইরের মাঠ দেখিয়ে বললেন জনাব ম্যাকনামারা, এখানে আপনি কী দেখছেন?

ম্যাকনামারা কাছে গিয়ে বললেন, কেন ঘাস!

শুষ্ক হাসি হেসে বঙ্গবন্ধু বললেন, মাই পিউপল উইল ইট গ্রাস। ইট উইল বি হার্ড বাট উই উইল নট ইল্ড টু ইয়োর আনজাস্ট ডিমান্ড (আমার লোক ঘাস খেয়ে থাকবে, তাতে কষ্ট হবে কিন্তু আপনাদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেবে না)।

ওয়াশিংটনে ফিরে এসে ম্যাকনামারা বাংলাদেশের শর্তেই ঋণ দিতে রাজি হয়েছিলেন।

ওপরের কথোপকথন অথবা ঘটনাটির কথা লিখিত আকারে কোথাও পড়িনি। কিন্তু তাঁকে জানতাম বলে জনাব গোলাম কিবরিয়ার বলা কোন কথাই অবিশ্বাস করতাম না। সে সময়কার জ্যেষ্ঠ আমলাদের কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। তাঁরা ঘটনাটির সত্যাসত্য যাচাই করতে পারবেন। বয়সের বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সাথে তাঁর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমলা মহলে তিনি একজন অতি সজ্জন, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলে জানতাম। বছর চারেক আগে তিনি মারা গেছেন।

[ওপরের বর্ণনাটি কানাডার এক আদালত বাংলাদেশে পদ্মাসেতু নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে/হয়েছে বলে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগকে নাকচ করে দেয়ার পরে লেখা। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'বাপ কা বেটি' নামে একটি নিবন্ধের অংশ বিশেষ। লেখাটি প্রকাশ হবার পর '৭২-'৭৫ ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান, অর্থনীতির অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আমার বর্ণনার খুঁটিনাটির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে প্রাপ্ত বিশ্বব্যাংকের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থান নিয়ে আমার বক্তব্যের সাথে একমত ছিলেন।]

এগারো

নির্ভিক বঙ্গবন্ধু: জনাব গোলাম কিবরিয়ার স্ত্রী নাদেরা বেগমও ছিলেন আমার আরেক ফুপুর কন্যা। ওয়াশিংটন ডিসিতে দেখা ও পরিচয় হবার পরবর্তী তিন বছরের প্রতি সপ্তাহের দুইতিন দিন আমাদের দুটি পরিবারের একত্রে থাকা হতো। নাদেরা আপা ছিলেন মুনীর চৌধুরীর ছোটবোন। তাঁর তখনকার সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড বিস্ময়ের সাথে আজো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ভাষা আন্দোলনের আগেপিছে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত থাকায় তাঁরা দুজনেই কারাবরণ করেছিলেন বহুদিন। দুজনের পিতাই বৃটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত অবস্থায় পরবর্তীতে ছিলেন পাকিস্তান সরকারের চাকুরে। আর কখনো রাজনীতি করবেন না এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন না এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার করে কিবরিয়া ভাই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। ১৯৮৩-৮৬র তিনটি বছর বিভিন্নভাবে

তখনকার রাজনীতি, বিশেষ করে তাদের সম্পৃক্ততা নিয়ে আমি তাদের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। সফল হইনি।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এবং নাদেরা আপা সরকারের কাছে দেয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু একজন রাজনীতিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে কিবরিয়া ভাইয়ের কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালে জনাব গোলাম কিবরিয়া তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মস্কো ভ্রমণের সময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তিনি বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখে তাঁর কেমন লেগেছিল সে বর্ণনা তিনি বেশ কয়েকবার আমার কাছে দিয়েছিলেন। তাঁর উচ্চারিত বাক্যগুলো হুবহু মনে নেই কিন্তু প্রতিবার একইভাবে চোখেমুখে, স্বরে ও ভাষায় ফুটে ওঠা তেমন প্রশংসনীয় অভিব্যক্তি আমি অন্য কোথাও দেখিনি। আজও তাঁর বলার ভঙ্গি আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে। তাঁর কথাগুলোর কিছু কিছু যা মনে আছে তা এরকম: 'মাথায় শীতের টুপি এবং কালো ওভারকোট পরা কী বিশাল এক ব্যক্তি প্লেন থেকে নেমে এলেন। কী নির্ভিক, আর চেহারায় কী আত্মপ্রত্যয়! বিমানের নিচে দাঁড়ানো (সোভিয়েত) প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ। পৃথিবীর এক পরাশক্তির প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি যে শ্রদ্ধা-সম্মানের সাথে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন, তা এক দেখার মতো দৃশ্য ছিল। মাথাটি উঁচু রেখে একইভাবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) গার্ড অব অনার গ্রহণ করলেন।'

কিবরিয়া ভাইয়ের মুখে মস্কোতে দেখা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের আরেকটি ঘটনার কথাও মনে আছে। রাষ্ট্রীয় সফরের সময় একটি হোটেল বা বাড়িতে বঙ্গবন্ধু অবস্থান করছিলেন। তখন অনেক রাত। একটি ঘরে বঙ্গবন্ধু ঘুমাচ্ছেন। অন্য একটি ঘরে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মচারিরা আড্ডার সাথে ধূমপান করছেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুমের পোষাক পরা বঙ্গবন্ধু এসে সেই ঘরে ঢুকলেন। হতচকিত হয়ে ঘরের সবাই সিগারেট লুকাতে এবং হাত নেড়ে ধোঁয়া সরাতে সচেষ্ট হলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার সাথে তোমরা যদি এভাবে দূরত্ব সৃষ্টি কর, তাহলে তো আমরা একসাথে কোনো কাজই করতে পারবো না। আমাকে দেখে সিগারেট লুকাতে হবে না, যেভাবে টানছিলে সেভাবেই থাকো। দাও, আমাকেও একটি দাও, অনেক্ষণ পাইপ টানছি না।

বারো

গ্রিক ছাত্রের বঙ্গবন্ধু: ১৯৭৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের কোনো এক সময়। আমি জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষারত। জাপানি ভাষা মোটেই বুঝি না, ইংরেজি জানা লোকও খুব কম। চাতক যেমন জলের পিপাসায় কাতর হয়ে থাকে, আমিও তেমনি বাংলায় কথা বলতে মুখিয়ে আছি। কথায় কথায় এক জাপানি ভাষা শিক্ষক বললেন তার নিয়মিত কর্মস্থল কানসাই ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছরই কয়েকজন করে বাঙালি ছাত্র আসে। তাঁর ছাত্র নয়, পরিচয়ও নেই, কিন্তু ওরা বাস করে মিনামি-সেনরি-তে 'রিউ-গাকসেই কাইকান' বা বিদেশি ছাত্রদের আবাসে।

আমাদের শেষ রেলস্টেশন কিতা-সেনরি থেকে একটি স্টেশন পরেই মিনামি-সেনরি স্টেশন। ক্লাশ শেষে আমি সেদিনই ছুটলাম সেদিকে।

শনিবার বিকেল। ছাত্রাবাসের লবিতে কেউ নেই। নামফলক খুঁজে দেখলাম বাংলাদেশি হওয়া সম্ভব এমন 'সালেহ মতিন' নামে একজন এখন তিনতলায় তাঁর কক্ষেই আছেন। অফিসে গিয়ে বলতে মাইক্রোফোনে তাঁকে ডাকা হলো।

আমি অপেক্ষা করছি। সালেহ মতিন আসছেন না। একজন লম্বামত সুবেশী ও সুপুরুষ ছাত্র কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই যে সালেহ মতিন বলে একটি নাম দেখা যাচ্ছে তিনি কোন দেশের ছাত্র তা কি জান? বললো, হ্যাঁ সে তো বাংলাদেশের, কিন্তু তুমি?

আমার মুখে 'বাংলাদেশ' শুনে তার মুখের হাসিটি আরো বিস্তৃত হলো। স্বরটি নামিয়ে কিন্তু স্লোগান দেয়ার ভঙ্গিতে ডান হাত উঁচু করে উঠিয়ে, নামিয়ে, আবার উঠিয়ে ভিনদেশি উচ্চারণে বলে চললো:

'জয় বাংলা'
'আমাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'
'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই'

আমি যুগপৎ আশ্চর্য, গর্বিত, ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে ফিরতি হাসি উপহার দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন দেশের বন্ধু গো?

বললো সে গ্রিস থেকে এসেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্র হিসেবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় আগ্রহভরে আমাদের সংগ্রামটি অনুসরণ করেছে। কারণ সেটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর গবেষণার বিষয়। কাজেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সব কথাই তার মনে আছে।

এসব বলতে বলতে স্বাধীনতার অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

বাংলাদেশের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুরবস্থাকে আমলে না নিয়ে শুধু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশি কোনো ব্যক্তি থেকে এই অভিনন্দন আমার চোখে পানি এনে দিয়েছিল। আর তা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু নামের মাত্র একটি মানুষের জন্য। আবেগময় এই স্মৃতিটি কখনো লেখার প্রয়োজন হবে তখন জানা ছিল না। থাকলে গ্রিক সেই ছাত্রের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখতাম এবং তাকে বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাতাম।

তেরো

জাপানি এনসাইক্লোপেডিয়া: ১৯৭৯ সাল। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব ছেড়ে মাস কয়েক আগে আমি কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-প্রকৌশল বিভাগে গবেষণা করছি। আর একজন বাঙালি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকলেও বাস করতেন দূরের ওসাকা শহরে।

একদিন আমার অধ্যাপক সাবুরো ফুকুই জানালেন সামাজিক অনুষদের এক অধ্যাপক একটি বই লিখছেন। তাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে আমার সাথে দেখা করতে চান। সেই লেখক-অধ্যাপকের নামও আমার

মনে নেই। তবে এক সন্ধ্যায় কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয় তিনি আমাকে যথেষ্ট সৌজন্যতার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

বললেন, তিনি জাপানি ভাষায় একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লেখা ও সম্পাদনা করছেন। তাতে সংযোজনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী লিখেছেন। সেটির সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। কিন্তু বছর কয়েক আগে তাঁকে হত্যাকারী চক্র বর্তমানে ক্ষমতাসীন বলে টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের স্মরণাপন্ন হতে চান না। তাই কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি-ছাত্র অফিসে খোঁজ নিয়েছেন বাংলাদেশের কোনো ছাত্র আছে কিনা। তাঁর ধারণা ছাত্রটি নিরপেক্ষ মতামত দেবে।

তাঁর প্রশ্ন ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি দেখেছি কিনা, অথবা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি কিনা। গুটি কয়েক শব্দার্থ ছাড়া আমি তখনো জাপানি ভাষার কিছুই বুঝি না। ভদ্রলোক তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু ইংরেজিতে অনুবাদ করে আমাকে শোনাচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সাথে আমার সম্মতি পেলে তা আবার টুকে নিচ্ছিলেন। সবকিছু এখন মনে নেই। যে ব্যাপারটি মনে আছে তা হচ্ছে মূলত একাত্তরের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্য থেকে বঙ্গবন্ধুর একটি বর্ণনা তিনি লিখেছিলেন যাতে মেশানো ছিল সহানুভূতিশীল এক কলমের আঁচড়। যে ঘণ্টাখানেক সময় আমি দিয়েছিলাম তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আমাকে একটি সুন্দর ক্যালকুলেটার উপহার দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন হাতেগোনা কারো কারো হাতে ক্যালকুলেটার দেখা যেতো।

আমি যে সময়কার কথা বলছি তখন বিদেশিদের মুখে 'বাংলাদেশ' নামটি তাচ্ছিল্যের সাথে উচ্চারিত হতো। তার ওপর সামরিক সরকারি উদ্যোগে হেয় প্রতিপন্ন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অফিস-আদালত-নথি, মায় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছিল। এই অবস্থায় নিজ উদ্যোগে এক অধ্যাপক জাপানি পাঠকদের কাছে আমাদের জাতির পিতাকে পরিচয় করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম।

চৌদ্দ

সিদ্ধার্থ শংকর রায়: ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ সময়কার ঘটনা। ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের তখনকার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফোন করলেন। বললেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে তার বাসায় দাওয়াত করেছেন আসছে শনিবার সন্ধ্যায়। আমি যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকি।

আমি বিজ্ঞানী মানুষ, স্ত্রীপুত্র ছাড়া সাধারণত বিজ্ঞানীদের সাথেই আমার ওঠাবসা। ইতোপূর্বে অবসরপ্রাপ্ত কারো কারো সাথে আলাপ পরিচয় হলেও দায়িত্বরত বিদেশি কোনো রাষ্ট্রদূতের সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু এখন দেখা হবে নেপাল, ভুটান, বা মালদ্বীপের কেউ নয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহচর, ভারতের দূতাবাস-প্রধানের সাথে। যার সাথে দেখা হবে তিনি শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রদূতই নন, তিনি সিদ্ধার্থ শংকর রায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁর নামটি প্রায়ই শোনা যেতো। যিনি আমাদের নারায়ণগঞ্জের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রায়ের দৌহিত্র। সাইফুল সাহেবকে বললাম, আমি অবশ্যই আসবো।

> বাংলাদেশের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুরবস্থাকে আমলে না নিয়ে শুধু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশি কোনো ব্যক্তি থেকে এই অভিনন্দন আমার চোখে পানি এনে দিয়েছিল। আর তা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু নামের মাত্র একটি মানুষের জন্য। আবেগময় এই স্মৃতিটি কখনো লেখার প্রয়োজন হবে তখন জানা ছিল না। থাকলে গ্রিক সেই ছাত্রের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখতাম এবং তাকে বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাতাম।

বেথেসডায় তাঁর বাসায় পৌঁছে দেখলাম দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন তিনচার জন কর্মকর্তাদের নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছেন। বসার ঘরে রাষ্ট্রদূতের সমপর্যায়ের, এমন কি নিম্নতর কোনো বাংলাদেশি কূটনীতিকেরও দেখা পেলাম না। ভেবে পাচ্ছিলাম না আমাদের বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কেন সাইফুলের বাসায় এলেন?

সাইফুল বললেন, কোনো এক গানের আসরে রাষ্ট্রদূতকে নজরুলগীতির ভক্ত মনে হয়েছিল। তখন সে নিজ গৃহে পূর্বনির্ধারিত নজরুলগীতির এক বিখ্যাত ওস্তাদের জলসায় নিমন্ত্রণ করলে রাষ্ট্রদূত সাথে সাথে তা গ্রহণ করেছিলেন। মনে পড়লো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে, বাহাত্তরের সম্ভবত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই সিদ্ধার্থ শংকর রায় ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। সমস্ত প্রটোকল ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের ডাইনিং রুমে তিনি ছাত্রদের সাথে বসে ডাল-ভাতও খেয়েছিলেন! কাজেই সাইফুলের ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাটা তাঁর পক্ষে অসাধারণ কোনো ব্যাপার ছিল না।

খাওয়াদাওয়া এবং গানের জলসার আয়োজন করতে সাইফুল ভেতর বাড়িতে ব্যস্ত। রাষ্ট্রদূত এবং অন্যদের সাথে আমার পরিচয় ও করমর্দন হলো। একজন ছাড়া

তিন-চারজন বাংলাদেশি এবং প্রায় সমসংখ্যক ভারতীয়দের সবাই চুপ। সাউন্ড সিস্টেম সাথে নিয়ে আসা বাংলাদেশের বয়স্ক ব্যক্তিটি বিরামহীন কথা বলে যাচ্ছেন। নিজ পরিবারের সবার মাহাত্ম্য বর্ণনার পর কেনিয়ায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের জীবনযাত্রা যে কী নোংরা, এবং এখনো যে কী নোংরা বস্তিতে বাস করে তার ঘৃণিত বর্ণনা।

একটি দেশের রাষ্ট্রদূতের সামনে বসে তাদেরই দুর্নাম করা যে চূড়ান্ত অসৌজন্যতামূলক, তা তিনি একেবারেই ভাবছেন না। চারপাশে বসা অতিথিরা চুপ থাকলেও সবাই অস্বস্তিতে উসখুস করছে। আমিও তাই, কিন্তু নিজে কূটনৈতিক ভাষা জানি না বলে চুপ করে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বয়স্ক লোকটির বাচালতাকে অগ্রাহ্য করতে শরীর নাড়া দিয়ে আমি রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকালাম। গলার স্বরটিকে আরো উঁচু করে হাসিমুখে বিনয়ের সাথে বললাম 'স্যার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি খুব কর্মতৎপর ছিলেন, পরে বঙ্গবন্ধুর সাথেও আপনার নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখনকার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।'

স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার কথার সাথে সাথে রাষ্ট্রদূত এবং উপস্থিত সবার চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো। রাষ্ট্রদূত যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। নড়েচড়ে বসে তিনি কথা বলা শুরু করলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ব্যক্তিগত দূত হিসেবে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় বিভিন্ন শ্রেণির শরণার্থীদের দুঃখকষ্টের সাথে যেমন পরিচয় ঘটেছে, তেমনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের সাথেও কাজ করতে হয়েছে। সেসবের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তাঁর সেদিনের কথার অধিকাংশই আমাদের জানা এবং ইতিহাসের অংশ বলে সেসব মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি। এর মাঝে তাঁর পূর্বপরিচিত ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক সরকার কবীরুদ্দিন উপস্থিত হলে পরিবেশটি আরও হালকা হয়ে এসেছিল।

রাতের খাওয়ার সময় আমি বসেছিলাম একই টেবিলে, তাঁর পাশে। আমি মুক্তিযুদ্ধ এবং তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম।

একাত্তরের ১০ই মার্চ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোকে তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে গভীর শ্রদ্ধার সাথে বর্ণনা করেছিলেন। রাষ্ট্রদূতের কাছে বঙ্গবন্ধুকে তখন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, একজন বিশ্বনেতা বলেই মনে হচ্ছিল। আমার আরেক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধুকে তিনি 'দেশবাসীকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন' বলে মূল্যায়ন করেছিলেন। সাথে যোগ করেছিলেন, 'মানুষকে বিশ্বাসও তিনি করতেন খুব বেশি, আর সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হয়েছিল।'

এই কথা বলে আনমনা হয়ে তিনি বললেন, 'আমার ঘরের দেয়ালে একটি বাঁধানো ছবি আছে। বঙ্গবন্ধুর একপাশে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, অপর পাশে আমি। তাঁরা দুজনেই আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। বন্ধুদের যে-ই সেই ছবিটি দ্যাখে, জানতে চায় আমার সময় কবে?'

পুরোটা সময় তিনি ইংরেজি নয়, বাংলাতেই কথা বলেছিলেন।

পনেরো

পিটার হোবার্ট: আমার বর্তমান কর্মস্থলে ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ড. পিটার হোবার্ট আমাদের প্রতিষ্ঠানটির সাইন্স ডাইরেক্টার ছিলেন। তিনি বহুবছর অন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন। কাজে যোগ দেয়ার পর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পর্যায়ক্রমে ডেকে ডেকে পরিচিত হওয়ার অছিলায় প্রত্যেকের গবেষণার বিষয়েও অবগত হচ্ছিলেন। আমার পালা যেদিন এলো একপর্যায়ে আমার জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

বাংলাদেশ নামটি শোনার সাথে সাথে উত্তেজনার সাথে বলে উঠলেন- মুজিব, মুজিব! খুব খুশি হয়ে আমি উৎসাহের সাথে বললাম, ওহ, তুমি তাঁর কথা জান?

বললেন, জানবো না কেন? আমার ছেলেকেই তো আমরা মুজিব বলে ডাকতাম। বললেন, ওহ, সেই একাত্তর সাল! টেলিভিশন খুললে এমন একটি দিন যেতো না যে ইস্ট পাকিস্তানের কোনো খবর থাকতো না। আর সেই খবর মানেই মুজিব, শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই মুজিব নামটি আমাদের সবার কাছেই খুব পরিচিত ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম মুজিব নামটি নিশ্চয়ই ভালো লাগতো যে তোমার ছেলেকে ঐ নামে ডাকতে?

বললো, না ঠিক ভালো লাগতো তা নয়। আমার ছেলেটির তখন বয়স ছিল দুই, মানে টেরিবল টু! ঐ বয়সের ধর্ম অনুযায়ী খুব ছুটাছুটি করতো, নতুন সবকিছু ধরতে চায়, দেখতে চায়। যা চায়, তা ওর পেতে হবেই! ছেলেকে সামাল দিতে আমরা হিমশিম খেতাম। আর পৃথিবীর ঐ কোণের মুজিব নামের লোকটিও অশান্ত, যেন নতুন কিছু করতে চাইছে। যা চাইছে এর একফোঁটা কম পেলে হবে না। মুজিব নামটি শুনছিও প্রতিদিন। কাজেই সন্তানের অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে স্নেহের আতিশয্যে ওকে আমরা 'মুজিব' নামে ডাকতাম।

এটি লিখতে গিয়ে খোঁজ নিয়েও পিটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। তখন ভাবিনি যে এ নিয়ে কোনোদিন কিছু লিখবো। জানলে তখনকার আমেরিকানদের কাছে 'মুজিবের' পরিচয় সম্পর্কে আরো জেনে রাখতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক: বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের অনেক স্মৃতি আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান একে অপরের সাথে নানাবিধ সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিলো। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সাংবাদিক রঞ্জন মল্লিক।

প্র: বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে কিভাবে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হলেন?

উ: বঙ্গবন্ধুর সাথে সম্পর্ক ১৯৫৭ সাল থেকে। বঙ্গবন্ধুর সাথে যখন প্রথমবার দেখা হলো তখন তিনি আতাউর রহমান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কিছুদিন পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মাধ্যমে মুজিবুর রহমানের সাথে সম্পর্ক হয়ে গেল। তারপর একদিন ড. কামাল হোসেন আমাকে ডাকলেন, বললেন আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিন। তখন আমি যতটা পারি কাজ করি। ১৯৬৪ সালে

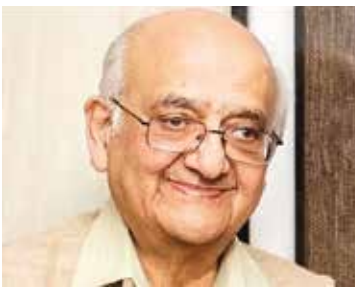

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো কী হবে তা তৈরি করার ব্যাপারে সহযোগিতার দরকার ছিলো। ঐ সময় আমার বয়স বেশি ছিল না। তারপর তো ১৯৭০ সালে প্রফেসর নুরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন, আমি, আনিসুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো প্রিপারেশনে ব্যস্ত ছিলাম। আওয়ামী লীগের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো আমরা চার/পাঁচ জন মিলে তৈরি করলাম।

তারপর তো মার্চ ১৯৭১এ আলাপ-আলোচনা, প্রিপারেশন, নেগোশিয়েশন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঐ সময় আমি, নুরুল ইসলাম, আনিস রাজনীতির কঠিন বাস্তবতায় নানাবিধ কাজে যুক্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক এতো গভীর ছিলো আমরা আলাপ-আলোচনা করে সব কাজের সিদ্ধান্ত নিতাম।

স্বাধীনতার পরে তো আরেকটা প্রফেশনাল সম্পর্ক শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরদিন, নেক্সট ১১ জানুয়ারি প্রফেসর নুরুল ইসলামের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হলো। তিনি প্রফেসর নুরুল ইসলামকে ডেকে বললেন,

আমি তোমাকে ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি, প্ল্যানিং কমিশনে। তোমরা বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশন তৈরির কাজ শুরু করো। ঐ কমিশনে আমাকে মেম্বার করা হলো। এটাতো ছিলো একটা প্রফেশন্যাল সম্পর্ক।

তো আমি একটা বিশেষ সম্পর্কের কথা বলবো–উনিতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, টোটালি পাওয়ারফুল ম্যান। অত ক্ষমতা, কত পপুলারিটি, কত অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে দ্বিতীয় কোন লোক উনার (বঙ্গবন্ধু) ধারে কাছে ছিলেন না। তিনি প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ডেপুটি চেয়ারম্যান আর আমি মেম্বার হিসেবে নিয়োজিত হই। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমি প্ল্যানিং কমিশন থেকে রিটায়ার করে বিআইডিএস-এ চলে যাই। প্ল্যানিং কমিশনে যতদিন ছিলাম আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। বঙ্গবন্ধু কখনো আমাকে কোন ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করেননি। চাপ দেননি, বলেননি অমুককে চাকুরি দিতে হবে, এটা আমার আদেশ, কখনো ইনফ্লুয়েন্স করেননি, এই কাজটা করতেই হবে অর্থাৎ কাজে একটা ডিসিপ্লিন ছিল। বঙ্গবন্ধু অফিসিয়ালি ডেপুটি চেয়ারম্যানের (অধ্যাপক নুরুল ইসলাম) সাথে কথা বলতেন, আলোচনা করতেন, কিন্তু কখনো আমার ডিসিশন মেকিংয়ের মধ্যে উনার ইন্টারফিয়ারেন্স ছিল না। উনি নতুন লোক রিক্রুট করেছেন। ঐ সময় প্রথম অবস্থায়, নতুন প্রতিষ্ঠানে এক সাথে ৩০০/৪০০ লোক নিয়োগ দেওয়া হলো। কিন্তু কখনো ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি উনার (বঙ্গবন্ধুর) রিকোয়েস্ট আসেনি। এটা তো আন-ইমাজিনেবল। তিনি এভাবে ইনস্টিটিউটকে রেসপেক্ট করতেন। আমাকে দায়িত্ব দেন এবং বলেন কাজ করে যাও। এটা আমার মনে আছে। আরেকটা বিষয় আমার মনে আছে। উনি খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন, উনার মন বড়, ওনার হার্ট আরো বড়, আর উনি কত পাওয়ারফুল মানুষ কিন্তু জেনুইনলি একটা হিউমিলিটি ছিল, ভদ্রতা ছিল। মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিল। এতো বড় মাপের নেতা, আকাশি লোক, তিনি মানুষকে দেখছেন খুব আপন করে। যেমন, তুমি একটা সাধারণ লোক, তোমার সাথে দেখা হলো, আবার দশ বছর পর তোমার সাথে দেখা হলো, হি উইল রিমেম্বার ইউর ফেইস, এন্ড ইউর নেইম। আমার জীবনে অনেক বড় নেতাকে আমি দেখেছি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এমন আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল নেতা দেখি নাই। যে উনাকে (বঙ্গবন্ধুকে) সমর্থন দিয়েছেন, যে উনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের ইনস্পিরেশন ছিল, তাঁর প্রতি বঙ্গবন্ধুর খুব রেসপেক্ট ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উনার মেন্টর ছিলেন। কলিকাতায় সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন চিফ মিনিস্টার ছিলেন, কলিকাতায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সব সময় ডাকতেন বস বলে।

আমার মনে আছে ১৯৭২এর ১৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম উনার জন্মদিন হলো, এটা তো বিশেষ একটা দিন। বঙ্গবন্ধু তো মৃত্যুমুখ থেকে ফেরত এসেছেন, স্বাধীন দেশ, উনার ইনসপিরেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। উনি তো এখন সাধারণ লেভেলের লোক নন। উনি তো এখন আকাশি মানুষ। (উল্লেখ্য যে, আকাশি মানুষ বলতে রেহমান সোবহান বুঝিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বি। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি লোকের নেতা।)

প্রাইম মিনিস্টারের অফিস তখন হেয়ার রোডে, ঐ বেইলি রোডের কোনায় ছিল। দেশ স্বাধীনের প্রথম কয়েক বছর ঐখানেই প্রাইম মিনিস্টারের অফিস ছিল। ঐ সময় তো সিকিউরিটি বলতে কিছু ছিল না। যে কোন লোক ফুটপাথ থেকে চলে এসেছে, বলে, আমি একটু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে আসি। ঢুকে যেত, এখানে কোন বাধা নেই। হাজার লোক ঐদিন ফুল নিয়ে এসেছে, দেখা করবে, ফুল দিবে বঙ্গবন্ধুকে, উনার জন্ম দিনে সম্মান জানাবে। এভাবে সারাদিন চলে। তো দিনের শেষে এক/দুই মণ ফুল হবে প্রাইম মিনিস্টারের কার্যালয়ে। যখন মোটামুটি মেইন ক্রাউড চলে গেছে, ওটা তো ফাল্গুন মাস ছিল, আজকাল তো গরম পড়ে, ঐ সময় এতো গরম ছিল না। বঙ্গবন্ধু উনার এডিসিকে নিয়ে সব ফুল নিয়ে একগাদা ফুল নিয়ে, তিন নেতার মাজার হাইকোর্টের পাশে যান। এবং সমস্ত ফুল সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মাজারের উপর দিয়ে আসেন। সেখানে কোন নিউজ পেপারের রিপোর্টার ছিল না। কোন টিভি ক্যামেরা ছিল না। পাবলিসিটি ছিল না। তাঁর চিন্তার গভীরতা ছিলো। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে ছিল: I must remember and respect who launched me in politics. তিনি এই মাপের মানুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, আমি তো খবরের কাগজে নিউজ করি, এরকম একজন ব্যক্তি যার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, তাকে যে সমর্থন দিয়েছে, ইনস্পিরেশন দিয়েছে, তাঁকে তিনি এভাবে সন্মান দিয়েছেন। পলিটিক্যাল লোকদের মধ্যে এতবড় মাপের মানুষ খুব কম পাওয়া যায়।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের সাড়ে তিন বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন। ঐ সময় গরীব মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নে তিনি কি ধরনের পদক্ষেপ নেন?

উ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের লোক ছিলেন। অনেক রাজনৈতিক নেতা খ্যাতিলাভের পর জনগণ থেকে অনেক দূরে চলে আসেন। জনগণের নামে পলিটিক্স করে জনগণকে

ধোঁকা দেয়। আসলে উনার অন্তর থেকে একটা টান আছে, উনার সবসময় মনে ছিল আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি তো একজন সাধারণ লোক। বঙ্গবন্ধুর ডাইরি কেয়ারফুলি কত লোক পড়েছেন তা আমি জানি না। যদি পড়েন তবে বুঝবেন তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন। আজকাল সংসদে নেতারা যান

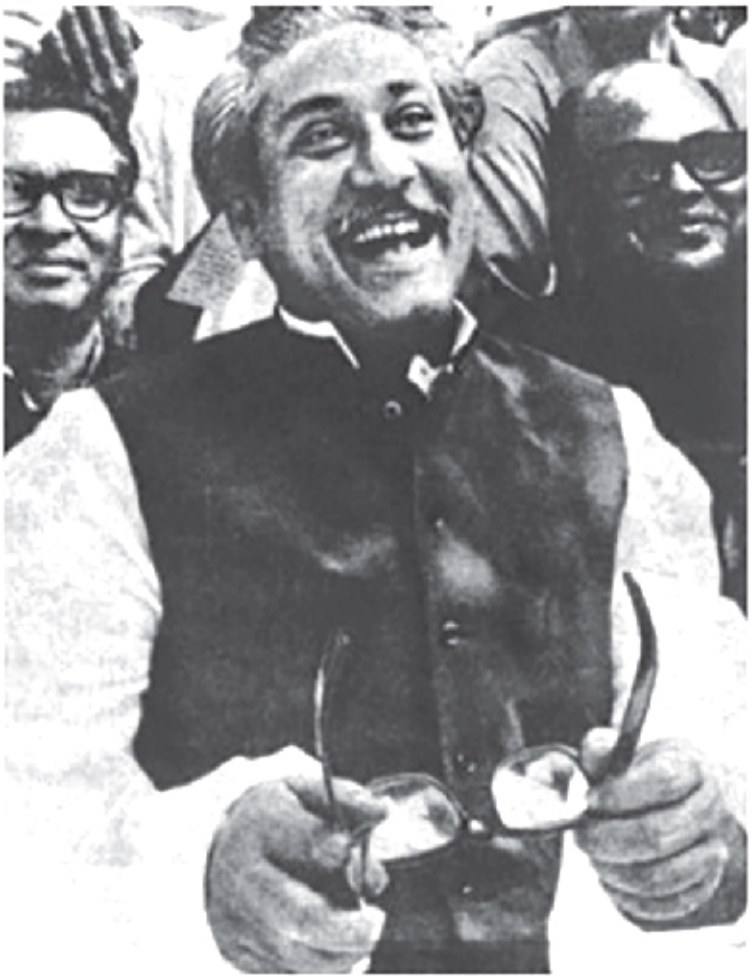

এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে চড়ে, অথচ উনার তো ঐ সময় নিজের গাড়ি ছিল না, টাকা-পয়সা ছিল না। তিনি বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্রেনের থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে, নৌকা দিয়ে, সাইকেল-রিকসায় চড়ে, পুরানো বাসে করে, এভাবে পুরো গ্রামকে গ্রাম, পুরো বাংলাদেশ ঘুরে আওয়ামী লীগকে তৈরি করেছেন। যেই লোক এরকম একটা পার্টি গঠনে যুক্ত থাকেন, উনিই পারেন প্রত্যেক সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট দুর্দশা বুঝতে। তারপর ১৯৭০ সালে যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন ছিল, উনার তো প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশকে স্বাধীন করতে হবে, এমন সময় আসবে তখন হয়তো পাকিস্তানি সৈন্যের সাথেও যুদ্ধ করতে হবে। মুক্ত ইলেকশন আজকে হয়তো হবে, নেগোশিয়েশনের চেষ্টা হবে, শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান হয়তো ক্ষমতা ছাড়বেন না। শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ লাগবে, যুদ্ধ ইয়াহিয়ার সাথে করতেই হবে। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, ট্র্যাডিশন্যাল মিডল ক্লাসের সমর্থন নিয়ে এ যুদ্ধ করা যাবে না–ইতিহাস একটু বড় শক্ত। শহরকে কেন্দ্র করে লইয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী এদের দিয়ে পরিপূর্ণ লড়াই হবে না। এরকম একটা ফাইনাল যুদ্ধের জন্য সাধারণ জনগণকে মোবালাইজ করতে হবে। সেই সাধারণ জনগণ হলো গ্রাম বাংলার কৃষক, তাঁতী, মজুর, কামার, কুমার। তো সাধারণ জনগণকে মোবিলাইজের জন্য আরেকটা অঙ্গীকার লাগবে এখানে। তারপর জনগণের যে চাহিদা, যে কষ্ট, যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে উনার যুদ্ধ ছিল, শুধু ওয়েস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তো যুদ্ধ নয়, একটা সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল। তো আমাকে বঙ্গবন্ধু গাইডিং ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন প্রিপারেশনের জন্য, ১৯৭০ এর ম্যানিফেস্টো প্রস্তুতের জন্য। তো এরকম ম্যানিফেস্টো করতে হবে–বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য, Self-reliant Bangladesh যেন প্রতিষ্ঠা পায়। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো ঐ সময়। ঐ যে Self-reliant Bangladesh, ওই ম্যাসেজ তো গ্রামে গ্রামে চলে গেছে। বঙ্গবন্ধু গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, স্বনির্ভর বাংলাদেশের কথা বলেছেন। এটা তো আমি নিজেও কয়েকবার দেখেছি। আমার মনে আছে, আমি একবার ইলেকশন ক্যাম্পেইনে বঙ্গবন্ধুর সাথে ঘুরছি। তাজউদ্দীন আহমেদের কনস্টিটিউয়েন্সি কালিগঞ্জে, ওখানে ভাষণ দেবেন। এখানে এবায়দুল কবিরের কনস্টিটিউয়েন্সিও। বঙ্গবন্ধুর সাথে গাড়িতে গেলাম, আমাদের প্রথম স্টপেজ ছিল আদমজিনগর, আদমজিনগরে যেসব মাঠ আছে ওখানে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক জড়ো হয়েছিলো। তাছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত এরাও ছিল। আর মধ্যবিত্তেরা তো সমর্থন দিবেই। তাছাড়া পার্টির কত নেতা দেখলাম। আসলে মূল কথা হলো সাধারণ লোক উনাকে সমর্থন দিচ্ছে। একলক্ষের অধিক শ্রমিক জড়ো হয়েছে–এটাই ছিল তার মূল শক্তি। তারপর ওখান থেকে নদী পথে লঞ্চে করে ডেমরা থেকে কালিগঞ্জ প্রায় একঘণ্টা/দেড় ঘণ্টার রাস্তা-নৌপথ। দেখলাম পুরো নদীর দুই দিকে মানুষ ভিড় করেছিলেন। এই মানুষ কারা–এরা হলেন কৃষক, কৃষকের মা-বাপ-সন্তান,

কৃষকের বাপের বাপ সবাই বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখতে চায়। ঐ দিনটা ছিল আমার জন্য বড় একটা প্রাপ্তির দিন।

১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। বঙ্গবন্ধুর সবসময় মনে ছিল ঐ সাধারণ লোক শুধু আমাকে ভোট দেয় নাই, ঐ লোকগুলো আমার জন্য রক্ত দিয়েছে। যুদ্ধ কে করেছে, ঐ সাধারণ লোকরাই করেছেন। শ্রমিক, ওয়ার্কার, বস্তির মানুষ, কৃষকের সন্তান এরাই তো যুদ্ধ করেছে। রক্ত কে দিয়েছে, গ্রামের ঘরের সন্তানরাই দিয়েছে। সবাইতো এই শ্রেণীর লোক যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ত্রিশ লক্ষ লোকের শহীদরা তো এরাই, এরাই দেশের প্রাণ। এভাবে একটা দেশ স্বাধীন হয়, গ্রেট মেজরিটি তো এরাই।

বঙ্গবন্ধু সাধারণ শ্রেণির লোকদের চিনতেন, তাদের কথা সার্বক্ষণিক ভাবতেন, তাদের সমর্থন নিয়েই আজ তিনি দেশের রাজা হয়েছেন, তাই দেশের অর্থনীতিতে এই রকম একটা সমাজ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে বৈষম্য থাকবে না। বৈষম্য যেভাবে পাকিস্তান আমলে ছিল ঐরকম একটা সমাজ যেন আর না আসে, বঙ্গবন্ধুর এমন একটা আশা ছিল। তাহলেই তিনি ঐ সমাজের জন্য, নিপীড়িত বাংলার জন্য কিছু করতে পারবেন। তো শেষ পর্যন্ত বড়লোক, গরীব লোক সবার সাথে বঙ্গবন্ধুর সুসম্পর্ক ছিল। কখনো যদি উনি দেখেছেন–কোন লোক উনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাঁকে অপছন্দ করছে, বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল না এ লোককে শাস্তি দিতে হবে। তিনি ভাবতেন ঐ লোককে আমার বন্ধু বানাতে হবে। কেমন করে ঐ লোক আমার বিরুদ্ধে চলে যাবেন দেখবো। গুড বস্ তিনিই হবেন, যার শত্রু আছে, তাকে বন্ধু বানাতে হবে, এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন আজন্ম।

আজকাল তো টেন্ডেন্সি আছে, শত্রু আছে তো শত্রুই থাকবে। শত্রুকে যত কষ্ট দিতে পারি ততই ভালো। তিনি নিউট্রাল থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি অপোনেন্ট পার্টিকে জায়গা দিতেন। অপোনেন্ট ব্যক্তি বা দল দুর্বল সময়ে তাকে আঘাত করবে বা করতে পারে, এতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল, সবাইকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে আসবো। তারপর যাদের সাথে উনার প্রতিযোগিতা ছিল তাদের সাথে তার ভালো ব্যবহারও ছিল। যাকে তিনি বন্ধু ভেবেছেন, তাকে চিরজীবনের জন্যই বন্ধু হিসেবে ভেবেছেন।

> যতকিছু হয়েছে সবই চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে হয়েছে। তবে হয়েছে অনেক কিছুই, ওটা তো সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য, উনি দিনরাত পরিশ্রম করেছেন প্ল্যানিং কমিশন নিয়ে। উনার নজরে ছিল কিভাবে দেশে মজবুত অর্থনীতির ভিত রচনা করা যায়। তবে উনার আরো চাপ ছিল ডোনারের সঙ্গে, আমেরিকা তো ফুড শিপমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশে। ঐ সময় ফুডের একটা সংকট বাহির থেকে চলে আসে, ফলে সবকিছুতো উনাকেই সামলাতে হচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তখন আমরা এগুচ্ছিলাম। দেশ ও দেশের বাহিরের নানা বৈরি পরিস্থিতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সামাল দিতে হচ্ছিল। তবে এর মধ্যে থেকেও সবার সাথে তিনি পার্সোনাল সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন, যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার প্রথম পরিচয়, তার কিছুদিন পর খাজা নাজিমুদ্দীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা আসছেন। খাজা নাজিমুদ্দিন বেশ কয়েক বছর পর ঢাকায় আসবেন, উনি তো নবাব পরিবারের লোক, অনেক বড় লোক। তিনি জয়েন্ট বাংলাদেশ চীফ মিনিস্টার ছিলেন, গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান ছিলেন, ইস্ট পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার ছিলেন, পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। কিন্তু যখন উনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হলো, গোলাম মোহাম্মদ উনাকে বের করে দিলেন, উনার ঢাকায় একটা ঘরও ছিল না। যখন উনি এসেছেন–সব সময় তো আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ তর্কবিতর্ক ছিল–এটাতো পলিটিক্সের ইতিহাস। কিন্তু যখন খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় ফেরত এসেছেন, তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, আতাউর রহমানের সঙ্গে, খাজা নাজিমুদ্দীনের দেখা হবে এটা শেখ মুজিবের ভাবনায় ছিল। তিনি ভাবলেন খাজা নাজিমুদ্দীন কত বছর পর তার জন্মস্থানে ফিরে এসেছেন–তো উনার সাথে একটু সম্পর্ক রাখতে হবে। খাজা নাজিমুদ্দীনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন, বললেন আমার সাথে ভাত খাবেন। আমার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন।

বঙ্গবন্ধু আতাউর রহমানের সাথে কোন একটা সরকারি অফিসিয়াল ভিজিটে যাবেন, বঙ্গবন্ধু সাদা শেরওয়ানি পড়ে

এসেছেন, খাজা নাজিমুদ্দীন সেখানে উপস্থিত, ঐ সময় শেখ মুজিবুর রহমান খাজা নাজিমুদ্দীনকে সালাম করলেন। বললেন ঢাকায় আপনি যে কোন সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে আমাকে স্মরণ করবেন। আমি আপনাকে সেইভাবে সহযোগিতা করবো। বঙ্গবন্ধু বললেন, You can accept anything. শেখ মুজিব এতটাই বড় মাপের মানুষ ছিলেন, এক সময় খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব উনার উপর কত অত্যাচার জুলুম করেছেন, জেলে ভরেছেন, কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীনের দুঃসময়ে শেখ মুজিব তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শেখ মুজিব বলতেন, এদেশে নাজিমুদ্দিনের জন্ম হয়েছে, উনি বয়সে বড়, তাঁর সাথে ভালো ভদ্রতা করতে হবে–এরকম একটা খেয়াল ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতিতে এ ধরনের স্পেশাল ব্যাপার ছিল।

প্র: ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে জিডিপির হার আশাব্যঞ্জকভাবে বাড়ছিল কি?

উ: কয়েকটি ব্যাপার বুঝতে হবে। সাধারণ লোকজন তো শুধু মনে করেছে একটা যুদ্ধের মধ্যে আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। আমাদের আর ভাবনা–চিন্তা কি। আমাদের নাগালে সব কিছুই চলে আসবে। দেশের ঐ সব সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাবনাটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি জনগণের ভালোবাসা ছিল তীব্র। মানুষ মনে করতেন তিনি সবকিছু করে ফেলতে পারবেন। সত্যিকার অর্থে ১৯৭২ সালে আমাদের অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বংস বা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ধ্বংস, রাস্তাঘাট ধ্বংস, দুটো বড়ো বড়ো ব্রিজ পাকিস্তান স্যাবোটাজ করে চলে যায়। হাইওয়েতে কোন গাড়ি চলে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তবে মূল সমস্যা ছিল পাকিস্তানি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পূর্ববাংলার অর্থনীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তারা এক সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে পাকিস্তান চলে যায়। মূলত অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পাকিস্তান আমলে এদেশের ইকোনমি কন্ট্রোল করেছে, পূর্ববাংলার ভিতর এবং বাহির থেকে। ইকোনমি কন্ট্রোলের বিষয়গুলো হলো সব বড় বড় কারখানা, ব্যাংক, ইনসুরেন্স কোম্পানি, ট্রেডিং, পাটের ব্যবসা সব তো অবাঙালিদের হাতে ছিলো। হঠাৎ করেই ১৬ই ডিসেম্বরের আগে সব কিছু গুটিয়ে তারা চলে যায়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার পর খুব কম দেশেই এরকম অবস্থা হয়েছিলো। ইতিহাসে এরকম নজির নেই বললেই চলে। দেশ থেকে পুরো একটা ব্যবসায়ী ক্লাস উধাও। আমাকে তো প্ল্যানিং কমিশনে ক্ষমতা দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাঁড়া করাও। অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ্যালোকেট করে রিভাইভ করো। সবতো তখন আমার হাতেই ছিল। এসব কঠিন কাজ, তিন বছরের মধ্যে যে কিছু একটা হয়েছে এটা তো কল্পনার বাহিরে, এতো শীঘ্র আমরা কিছু একটা দাঁড়া করাতে পেরেছিলাম, এটাই তো অনেক। তারপর তিন বছরের মধ্যে সব কিছু কি গোলাপ বাগান হয়ে যাবে, এটা তো সম্ভব নয়। যতকিছু হয়েছে সবই চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে হয়েছে। তবে হয়েছে অনেক কিছুই, ওটা তো সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য, উনি দিনরাত পরিশ্রম করেছেন প্ল্যানিং কমিশন নিয়ে। উনার নজরে ছিল কিভাবে দেশে মজবুত অর্থনীতির ভিত রচনা করা যায়। তবে উনার আরো চাপ ছিল ডোনারের সঙ্গে, আমেরিকা তো ফুড শিপমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশে। ঐ সময় ফুডের একটা সংকট বাহির থেকে চলে আসে, ফলে সবকিছুতো উনাকেই সামলাতে হচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তখন আমরা এগুচ্ছিলাম। দেশ ও দেশের বাহিরের নানা বৈরি পরিস্থিতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সামাল দিতে হচ্ছিল। তবে এর মধ্যে থেকেও সবার সাথে তিনি পার্সোনাল সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

প্র: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, তাঁকে হারিয়ে আমরা কতটা পিছিয়ে গেছি?

উ: ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে শুধু এক ব্যক্তিকে হত্যা করেনি, তারা ইতিহাসকে হত্যা করেছে। মূলত একটা সমাজকে হত্যা করেছে। উনি যদি জীবিত থাকতেন, যে পরিশ্রমের দিন আমরা পার করেছি, যে কষ্টের দিন গেল, ফসল তো সব ১৯৭৫এর মধ্যে আসা শুরু করল, তার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছে। এটা তো চিন্তা-ভাবনা করেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কী কষ্টের দিন উনার মাথার উপর ছিল, কী অমানুষিক কষ্ট করে উনি একটা সংকট থেকে, যুদ্ধ করে দেশকে পাকিস্তানের কাছ থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। ফসল যখন ঘরে উঠল সে ফসল ব্যবহার করা হলো না, তখনই উনাকে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকপক্ষ ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধু তো দেশকে একটা সম্মানজনক স্থানে নিয়ে গেছে, এখন উনার শ্রমের ফসল আমরা ভোগ করবো, আমরা উনার গড়ে তোলা দেশকে শাসন করবো।

যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন তবে সাড়ে তিন বছরের কষ্টের ফসলের উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত তৈরি হতো। সব তো ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দেশ যে পথে গেল, হয়তো সে পথে যেত না। তিনি দেশকে একটা পূর্ণতা দিতে পারতেন–এটা আমার স্পেকুলেশন। আমার মনে হয়, আরেকটা ইতিহাস হতো। এতো সংকটের দিন থাকতো না। এতো মারামারি, এত কষ্ট, এত রক্তপাত হয়তো হতো না।

ইতিহাসের মহানায়কের সাথে কিছুক্ষণ

শাহজাহান ভূঁইয়া

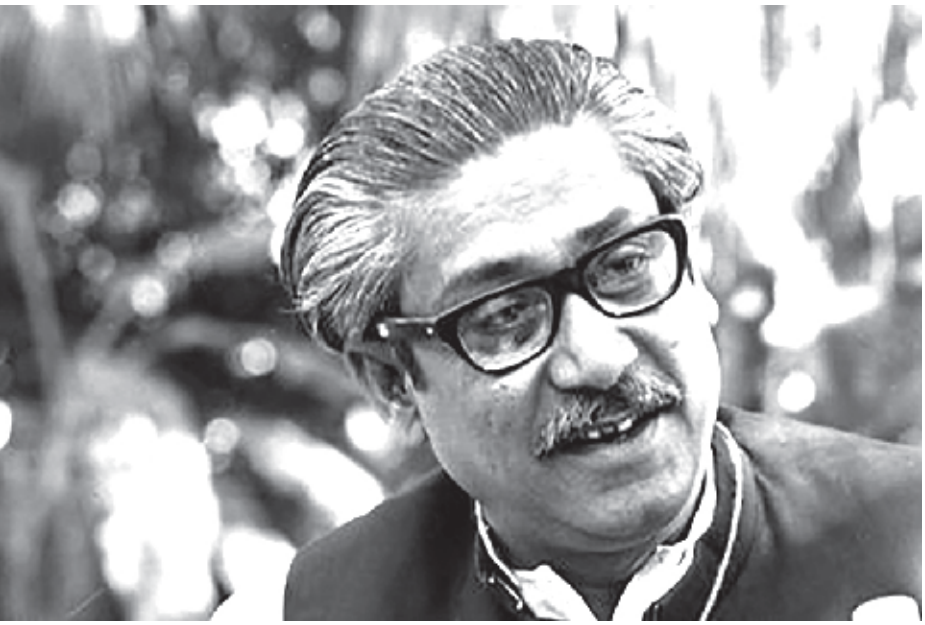

আদালতের সাক্ষীদের পবিত্র গ্রন্থে হাত রেখে বলতে হয়–"যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।" ১৯৬৯ সালের কথা। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কিছুক্ষণের একটি ঘটনার কথা বলছি। দিনতারিখ মনে নেই। স্মৃতির জানালা দিয়ে যতটুকু স্মৃতি মনে পড়ছে তাই বলছি।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মহানায়ক সেসময়ে মুক্ত। সেসময়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অধিবেশনে ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) অধিবেশনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেসময়ে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটিতে তোফায়েল আহমেদ এবং নূরে আলম সিদ্দিকী সভাপতি পদের জন্যে প্রধান দুই প্রার্থী। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে তোফায়েল আহমেদ বিপুল খ্যাতির জন্যে ছাত্রসমাজের চোখের মণিতে রূপান্তরিত হন।

নূরে আলম সিদ্দিকীও কারাগার থেকে মুক্ত। ছয় দফার জন্যে মিছিল করতে গিয়ে শ্রমিক মনু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর তার রক্তমাখা জামা নিয়ে মিছিল করাকালে নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। সেজন্যে সেও একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তখন তোফায়েল আহমেদ জয়ের নৌকার কাণ্ডারি।

আমি তখন ছাত্রলীগ ইকবাল হল ক্যাবিনেটের ক্রীড়াসম্পাদক এবং এর পূর্বে ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত থাকার জন্যে মোটামুটি পরিচিত। এই পরিচয়ের পশ্চাতে আরেকটি কারণ আমি ১৯৬৭ সালে ক্লাস ওয়ান মি. ইস্ট পাকিস্তান, মি. ঢাকা ডিভিশন এবং মি. ঢাকা হয়েছিলাম। তখন ১৮ ঘণ্টা পড়াশোনা করার বদলে সেই ১৮ ঘণ্টা পিণ্ডি না ঢাকা, পাঞ্জাব না বাংলা এই স্লোগান এবং মন্ত্রে নিমজ্জিত থাকতাম।

আমি এবং আমার সাথের অন্যরা নূরে আলম সিদ্দিকীর কারাবরণকে অতি মূল্যায়িত করেছিলাম এবং আমরা তার পক্ষে নিয়োজিত থেকে কাজ করেছিলাম। সেসময়ে আল মুজাহিদী এবং মান্নান একটি প্যানেল দেন। ছাত্রলীগে তোফায়েল আহমেদের জনপ্রিয়তার কাছে সবাই ভেসে যায় এবং তিনি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হন।

এই সুযোগে আল মুজাহিদী-মান্নান প্যানেলটি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় দিয়ে দেন এবং পরদিন তা ছেপে দেয়া হয়। আমরা যেহেতু তোফায়েল আহমেদের বিপরিতে অবস্থান নিয়েছিলাম সেজন্যে আমাদের গ্রুপের কয়েকজনকে ঐ প্যানেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং জাতীয় পত্রিকাতে ছাপা হয়। সেই প্যানেলে বিস্ময়ের সাথে দেখলাম আমার নামটিও ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছাপা হয়েছে।

সামনেই জাতীয় জীবনের অনেক মহাঘটনা অপেক্ষা করছে। তাই আব্দুর রাজ্জাক (রাজ্জাক ভাই) ও সিরাজুল আলম খান (সিরাজ ভাই) সকাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে এর একটা সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। যেহেতু আল মুজাহিদী-মান্নান প্যানেলের সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র সংযোগ ছিল না তাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম।

সেইদিন ও তারিখটি স্মৃতির পাতা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বিকাল বেলায় ডাকলেন। যতদূর মনে পড়ে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে যাই। আমার সাথে ছিলেন কাজী ফিরোজ রশীদ, ময়মনসিংহের আব্দুল আজিজ,

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তফসিরুল ইসলাম, লুৎফর রহমানসহ যশোর, কুমিল্লা ও সিলেটের আরও কয়েকজন।

আমরা বঙ্গবন্ধুর বাসার সামনে ঘাটলাতে প্লাস্টিকবেতের চেয়ারে বসে আছি। আমাদেরকে ট্রেতে করে প্রথমে বাসা থেকে পানি দেয়া হয়। আমরা পানি খাচ্ছি, সেইসময়েই বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে আসলেন এবং উনার জন্যে রক্ষিত চেয়ারটিতে বসলেন। তার পরনে একটি সাদা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি। মহান ব্যক্তিত্ব। আমরা কিছু বলার আগেই মনে হয়েছিল সম্মোহিত হয়েছি।

উনার পাশে বসা ছিলেন ময়মনসিংহের আব্দুল আজিজ। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে কিছু বলার জন্যে আহ্বান করলে আব্দুল আজিজ বললেন, ইকবাল হলে এনএসএফ যে কোনো ইউনিট খুলতে পারেনি তার কারণ আমরা। তোফায়েল ভাই আমাদেরকে উনার কাছে টেনে নেননি এবং আরও কী কী বললেন আজ মনে নেই।

এই সময়ে যশোরের একজন কী যেন বলা শুরু করেছিল। একটু শোনার পরেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "তুই রাজনীতি অনেক বুঝিস। তোকে আমার সাথেই নিয়ে নেব। ছাত্রলীগের রাজনীতি তোর আর দরকার নাই।" এই কথার পরে সে আর কিছু বললো না। বঙ্গবন্ধু এর পরেপরেই তোফায়েল আহমেদকে বললেন, এদের জন্যে যা যা করার তা যেন তিনি করেন।

সমাধানতো হয়ে গেল। এবার তোফায়েল আহমেদ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি শাহজাহানের সাথে কী করেছি। আমার সাথে কথা বলে না। যাক, মান-অভিমান শেষ হয়ে গেল। সাথে সাথে মুজাহিদী-মান্নান প্যানেলের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তোফায়েল ভাইয়ের প্যানেলের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। বিবৃতি লেখা হলো।

তিনি ছিলেন রাজনীতির হ্যামিলনের বংশীবাদক। অসম্ভব সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মানুষকে ক্ষণিকের মধ্যেই তার একান্ত ভক্ত এবং আপনজন করে নিতে পারতেন। যার সাথে পরিচয় হয়েছে তাকে অনেকদিন পরও নাম ধরে ডাকতে পারতেন এবং ভালবাসার বন্ধনে জড়াতেন।

সেদিনের ঘটনায় মনে হয়েছে অনেক কঠিন সমস্যার অনেক সহজে সমাধান করতে পারতেন বঙ্গবন্ধু। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিতেন না। এটা সত্য তিনি মানুষকে ভালবেসে তাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলে দিতে পারতেন। তাইতো একাত্তরের যুদ্ধে বৃদ্ধ নরনারী যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারেনি তারাও দিবানিশি তার সুস্বাস্থ্য ও মুক্তির জন্যে দোয়া প্রার্থনা করেছেন। এই মহান নেতা বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান থাকবেন এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

যতদূর মনে পড়ে, তোফায়েল ভাই ও আমরা কজন পুরাতন একটি টয়োটা গাড়িতে করে সমস্ত জাতীয় পত্রিকার অফিসে গিয়ে লিখিত বিবৃতিটা দিয়ে আসি যা পরের দিন ছাপা হয়েছিল। কাজ শেষ করে আমরা ছেনু পালোয়ানের দোকানের মোরগ-পোলাও খেয়ে যার যার গন্তব্যে পৌঁছি।

আমি আমার জীবনে বঙ্গবন্ধুর মতো এই মহান ব্যক্তিত্বের সাথে আরও বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হওয়ার ও তার কথা শোনার সুযোগ পেয়েছি। তিনি ছিলেন রাজনীতির হ্যামিলনের বংশীবাদক। অসম্ভব সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মানুষকে ক্ষণিকের মধ্যেই তার একান্ত ভক্ত এবং আপনজন করে নিতে পারতেন। যার সাথে পরিচয় হয়েছে তাকে অনেকদিন পরও নাম ধরে ডাকতে পারতেন এবং ভালবাসার বন্ধনে জড়াতেন।

সেদিনের ঘটনায় মনে হয়েছে অনেক কঠিন সমস্যার অনেক সহজে সমাধান করতে পারতেন বঙ্গবন্ধু। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিতেন না। এটা সত্য তিনি মানুষকে ভালবেসে তাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলে দিতে পারতেন। তাইতো একাত্তরের যুদ্ধে বৃদ্ধ নরনারী যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারেনি তারাও দিবানিশি তার সুস্বাস্থ্য ও মুক্তির জন্যে দোয়া প্রার্থনা করেছেন। এই মহান নেতা বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান থাকবেন এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

লেখক ও গবেষক
ভাইসচেয়ারম্যান, সিদীপ

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পিকেএসএফ ও সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মুলগ্রাম ইউনিয়ন ও রতনপুর ইউনিয়নে উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুবাদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়: কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/গল্প লেখা, চিত্রাংকন ও যুব কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

১-১৬ ডিসেম্বর ২টি ইউনিয়নে ১৮টি ওয়ার্ডে যুব সমাজের অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে প্রতিটি বিষয়ে ২ জনকে বাছাই করে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচন করা হয়। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

- আবু রায়হান
(উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার চারগাছ ব্রাঞ্চ, কসবা, বি-বাড়ীয়া)

সিদীপের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সংস্থার চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এজিএম শুরু হয় সন্ধ্যায়। সংস্থার চেয়ারম্যান ড. আব্বাস ভূঁইয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। ভাইস চেয়ারম্যান প্রথমেই স্মরণ করেন সংস্থার সদ্যপ্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে। তিনি বলেন, "তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। আমরা অত্যন্ত শোকাহত।"

এরপর সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন, "বার্ষিক প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি। প্রতিবেদন শুরু হয়েছে করোনা-দুর্যোগকালে আর্থিক সেবার স্থবিরতা নাড়াতে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সিদীপের সহায়তার এক বাস্তব বর্ণনা দিয়ে।"

চেয়ারম্যান ড. আব্বাস ভূঁইয়া বলেন, "আমার একটা প্রস্তাব হচ্ছে Yahiya Memorial Trust করা যায় কিনা। যাতে ইয়াহিয়ার স্মৃতি পৃথিবীতে অম্লান থাকে।"

সভায় সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব এম খায়রুল কবীর এ সম্পর্কে বলেন, "তথ্যপ্রযুক্তিতে অ্যাপসের ব্যবহার হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্মীরা এতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে কিনা। টেলিডার্মা শুরু হয়েছিলো, এর অর্জন যদি আমরা জানতে পারতাম।"

জনাব মাহমুদুল কবীর বলেন, "এসডিজি ও সরকারি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিতে হবে। There are plenty of opportunities."

জনাব সালেহা বেগম বলেন, "আমি একটা গবেষণা থেকে দেখেছি, যেসব মেয়ে শিক্ষা সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছে এই মেয়েরা উন্নয়নমূলক আরও বিভিন্নরকম কাজে উৎসাহী।"

বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনায় সংস্থার নতুন ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া বলেন, "আমরা একটা নিউ নরমাল সিচুয়েশনের দিকে যাচ্ছি। আগামীতে এই পৃথিবীর নরমস এন্ড ভ্যালুজ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। করোনাকালে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে কী ইনোভেশন আনতে পারি সেটা দেখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ আসবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস আসছে। এরফলে দরিদ্র শিশুরা ধনিক পরিবারের শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমাদেরকে দেখতে হবে কী ইনোভেশন করতে পারি। এছাড়া

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস আসছে। এরফলে দরিদ্র শিশুরা ধনিক পরিবারের শিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে।

সোশ্যাল কমোডিটিকে আমরা Standard of Living Improvement Commodity বলতে পারি।"

জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন, "ইয়াহিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে একটা প্রকাশনা থাকা দরকার। আমি প্রস্তাব করছি Life and Contribution of Muhammad Yahiya এরকম শিরোনামে একটা বই প্রকাশের।"

জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ বলেন, "বন্ধু বলেন ভাই বলেন ইয়াহিয়ার অভাব আমার কাছে পূরণ হবার নয়। তার অনুপস্থিতি বেনাদায়ক।"

জনাব শামা রুখ আলম বলেন, "ইয়াহিয়া যে এত সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান করেছে এবং এটা ধরে রাখার জন্য আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এসএমএপি ঋণ সহায়তায় সাফল্য

বহুমুখী আয়ের পথ দেখাচ্ছেন নাজমা খাতুন

মো. জাহিদ হাসান

সঠিক পরিকল্পনা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনায় খুব ছোট পরিসরে শুরু করেও যে ধাপে ধাপে সফলতার সিঁড়ি বেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছোঁয়া যায় চোখে আঙুল দিয়ে সে ব্যাপারটিই দেখিয়ে দিয়েছেন নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার শিবপুর গ্রামের নাজমা খাতুন। বাতলে দিচ্ছেন বহুমুখী আয়ের পথ। প্রথমে তিনি সিদীপের রাজাপুর শাখা থেকে জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এসএমএপি ঋণ নিয়ে দুটি গাভী কেনেন। সিদীপের এসএমএপি ঋণ কাজে লাগিয়ে তিনি তার গরুর খামার বাড়াতে থাকেন। এখন তার তিনটি গাভীসহ গরুর সংখ্যা ছয়টি। গরুর পাশাপাশি এখন তিনি ছাগলও পুষছেন এবং তা থেকে বেশ লাভবান হচ্ছেন। রোজ ২০ থেকে ২৫ লিটার দুধ পান। কিন্তু এই পরিমাণ দুধ তার নিজের গ্রামে বিক্রি করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। সিদীপের রাজাপুর শাখার কর্মীগণ স্থানীয় বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে তার দুধ বিক্রির স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলে তিনি তার দুধের বাজারজাতকরণের সমস্যা থেকে মুক্ত হন। গরু পালনের পাশাপাশি তিনি ধানচাষ, মাছচাষ এবং সবজিচাষ করে তার আয়ের পথ বাড়িয়ে নিয়েছেন। সবজির ভেতরে তিনি প্রতিসপ্তাহে শুধু শিমই বিক্রি করছেন পাঁচ হাজার টাকার। তার এই সার্বিক সফলতার পেছনে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম।

লেখক: উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ

নিমসারের মাঠ দিবসে সিদীপের

এসএমএপি-ঋণী কৃষকদের অংশগ্রহণ

প্রতাপ চন্দ্র রায়

২৯ নভেম্বর ২০২০ কুমিল্লা জেলায় সিদীপের নিমসার শাখার কর্ম-এলাকার আবিদপুর গ্রামে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মাঠ থেকে ব্রি ধান-৮৭ কাটা উপলক্ষে এক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এতে সিদীপের নিমসার শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তার অধীন এসএমএপি ঋণগ্রহীতা কৃষকগণ এবং নিমসার শাখার কৃষিকর্মকর্তা অংশ নেন। এই মাঠ দিবসে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বুড়িচং উপজেলার উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কৃষকদের এই ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। সিদীপের এসএমএপি ঋণী সদস্য আবুল হোসেন, আবদুর রহমান, আলী আহমেদ ও মফিজুল ইসলামসহ সিদীপের অন্য কয়েকজন ঋণী কৃষক সদস্যও এতে অংশ নেন। তারা আগামী মৌসুমে এই ধান চাষ করবেন বলে জানান।

লেখক: কৃষি কর্মকর্তা, সিদীপ

একজন শিক্ষার্থী একটি খামার

ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা

'একজন শিক্ষার্থী একটি খামার' হলো একটি স্বপ্ন–দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে বসবাসরত সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় কৃষিকাজকে (খাদ্যশস্য, পশুপাখি পালন, মৎস্যচাষ ও বনায়ন) জনপ্রিয় করা।

আর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে প্রধানত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে। মূলত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ বাড়ির আঙিনায় বাগান তৈরি করবে।

দ্বিতীয়ত, যেসব পরিবারে কোনো শিক্ষার্থী নেই সেসব পরিবারের কাছে সরকারের এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নিবিড় তত্ত্বাবধানে।

তৃতীয়ত, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ধারণা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাহায্যে কমিটি গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকরি সংস্থা, যারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করে, তাদেরও সাহায্য নিতে পারি।

আর শিক্ষার্থীরা এ বাগানের সবকিছু উৎপাদন করবে 'জৈবিক কৃষি পদ্ধতি' ব্যবহারের মাধ্যমে, যা 'সবুজ কৃষি' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করবে।

এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এতে সরকারের কাছে বাজেট প্রণয়নের কোনো প্রস্তাবনা দেয়া হবে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার স্থানীয় উৎসই এখানে কাজে লাগানো হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর আদেশ ও নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ঘোষিত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এতে খুবই কম খরচে শুধু বীজ ও অল্প পরিমাণ সার ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রকল্পের অংশীদারেরা তাজা, স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত সুষম খাদ্য পাবেন। এছাড়া চাষকৃত উদ্ভিদগুলো বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক থেকেও পরিবেশকে রক্ষা করবে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি যেমন–লালশাক, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, ধনিয়াপাতা, বেগুন, মরিচ, লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, চিচিঙ্গা, করোলা, শসা ইত্যাদি জন্মাতে উৎসাহিত করা হবে।

এর বাইরে চারা রোপণ ও ফসল উৎপাদনের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, এমনকি মাছ চাষও করতে পারবে। পাশাপাশি পরিবারগুলো উদ্যানচাষ, বনপালন এবং ঔষধি গাছ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ যেমন–পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, তাল, বেল, কামরাঙ্গা, সজিনা, নিম, বাতাবি লেবু, কাঁঠাল, আম এবং বিভিন্ন ধরনের কাঠ উৎপাদনকারী গাছ তাদের আঙিনায় বা বাড়ির পাশে লাগাতে পারবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের, বিশেষত বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে এবং এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইন্টারনেট ব্যবহার করেও কৃষিকাজের কৌশলগুলো শিখে নিতে পারে। সরকারের নির্দেশনায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানও তাদের কৃষিকাজে নানা ধরনের পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা করবে।

এ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোর বড় একটি অংশ উপকৃত হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ কর্মসূচি গ্রহণ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট লাভজনক বলে প্রমাণিত হবে।

এ কর্মসূচির আওতায় আনা পরিবারগুলো তাজা ও ভেজালমুক্ত শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের পাশাপাশি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারবে, যা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা তাদের বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে উৎপাদিত শাকসবজি বিনিময় করতে পারবে।

অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতখরচ হিসেবেও দেয়া যেতে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহে এটি সহায়তা করবে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা ডিম, মাছ, মাংস, ফলমূল ও শাকসবজি গ্রহণের দ্বারা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, খনিজ ও ভিটামিনের অভাব পূরণ করতে পারবে। তাদের লাগানো বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ শুধু ভেজালমুক্ত ও সুস্বাদু ফলই দেবে না, বরং তাদেরকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করবে।

এ কর্মসূচির বাগান পরিচর্যা, পশুপালন, মাছচাষ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনমানসিকতা সজীব হবে এবং তারা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এছাড়া এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে।

> এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এতে সরকারের কাছে বাজেট প্রণয়নের কোনো প্রস্তাবনা দেয়া হবে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার স্থানীয় উৎসই এখানে কাজে লাগানো হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর আদেশ ও নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ঘোষিত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এতে খুবই কম খরচে শুধু বীজ ও অল্প পরিমাণ সার ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রকল্পের অংশীদারেরা তাজা, স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত সুষম খাদ্য পাবেন। এছাড়া চাষকৃত উদ্ভিদগুলো বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক থেকেও পরিবেশকে রক্ষা করবে।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণের জন্য খাসজমি, রাস্তা ও রেলপথের পাশের জমি, চরের জমি, বেড়িবাঁধ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। আর এজন্য স্থানীয় বন বিভাগ কর্তৃক তাদের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নগর ও শহর অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির কাছাকাছি খালি জমি ব্যবহার করতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তারা জমি না পেলে তাদের বাড়ির ছাদও বাগান করার কাজে বা ছোট ছোট ফলের গাছ লাগানোর কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তারা তাদের বাড়ির বারান্দায় বিভিন্ন অব্যবহৃত পাত্র যেমন ব্যবহৃত তেলের কনটেইনারে বিভিন্ন ধরনের লতা বা লতাজাতীয় গাছ যেমন–করোলা, শসা, মরিচসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণের অব্যবহৃত খালি জমিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিভিন্ন মৌসুমি এবং অঞ্চল-উপযোগী শাকসবজি উৎপাদন করানো যেতে পারে। প্রস্তাবিত কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা 'ভার্মিকম্পোস্ট প্রযুক্তি' এবং জৈবসারসহ কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করতে পারবে।

এ লেখাটি কেবলই একটি ধারণা মাত্র। আমরা এ ধারণাকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা হিসেবে প্রস্তুতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, নাগরিক সমিতি এবং অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও মতামত চাইছি।

সাবেক উপাচার্য, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য।

একটি কাঠের চেয়ারের গল্প

আখতার জামান

কত ক্লাশ পাশ দিয়েছে মনীন্দ্র সেটা কেউ জানে না তবে তিনি যে শিক্ষিত এটা সহজে বোঝা যায়, তার ইংরেজি উচ্চারণ ভালো। উর্দু ভাষাও পরিষ্কার বলতে পারে। তার ভাষা শিক্ষা কিংবা অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানের উৎস হলো একটা থ্রি-ব্যান্ড ন্যাশনাল রেডিও। রেডিওটি কাঠের আলমিরার উপর তাকে বসানো। আলমিরার সম্মুখ ভাগের পাল্লার কাচ না থাকার কারণে সেটি উন্মুক্ত। আলো-বাতাস মশামাছি-আরশোলার নিরাপদ স্থান হিসেবে আলমিরাটি দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। ওসবের একটি তাকের উপর বসানো আছে মাটির তৈরি গোলাপী রঙের গনেশের মূর্তি। আলমিরার পাশে রাখা আছে একটা কাঠের চেয়ার। দুই হাতল বিশিষ্ট। সুদৃশ। শাল কাঠের চেয়ারটির চেহারায় আভিজাত্যের চিহ্ন। মনীন্দ্র এই চেয়ারটি অত্যন্ত যত্ন করে রাখেন। গামছা দিয়ে সকালে বিকালে পরিষ্কার করেন।

মনীন্দ্রের চায়ের দোকান। ঝাঁপ তোলা টিনের দোকানটিতে সামনের দিকে মাটির উঁচু করে বানানো দুটো চুলা। চুলা দুইটি ঢাউস আকৃতির। জ্বালানি হিসাবে গোবর শুকানো ঘষি চুলার মধ্যে ঢুকানো হয়, ছাই বের হয় নিচের অংশ দিয়ে। ঘষির হলুদ রঙা আগুনে কেটলির পানি ফোটে। সসপেনের গরুর দুধ বলকায় চুলার আগুনের তাপের সাথে সখ্যতা করে। চায়ের লিকার গন্ধ ছড়ায়, মনীন্দ্র খুব ভক্তি ভরে চা বানান। তার হাতের চায়ের সুনাম রয়েছে। ব্রিটিশ কারখানার তৈরী টিনের বাড়িতে যত্রতত্র ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ঘরটির সাইনবোর্ড না থাকলেও সবাই চেনেন–মনীন্দ্রের চায়ের দোকান। দুধ লিকারের চা। চা পানের অভ্যাস ভদ্রলোকদের এবং স্বচ্ছল ও অলস ব্যক্তিরাই চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে থাকেন। যাদের কাজকর্ম উল্লেখ করার মতো নয়–তারাই ঐ দোকানটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করে থাকেন! বক্তৃতা দেন। তর্ক জুড়ে যায়। হট্টগোল হয়। গরম-ঠান্ডা সকল আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মনীন্দ্রের হাতের দুধ-চা যেন মাদকের মতো কাজ দেয়। এ এক নেশা। ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া বাঙালিদের পান সংক্রান্ত নেশা। মনীন্দ্র সবার কথা শোনেন। তর্ক-বিতর্কের কোনো কোনো দল তাকে পক্ষে টানার চেষ্টা করে, মনীন্দ্র সাধারণত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। তাকে পেশাগত কারণেই স্বল্পভাষী হতে হয়েছে। তবে যখন বলেন, তখন সবাই তার কথা গুরুত্ব দিয়েই শোনেন। মনীন্দ্রের বয়স কত–এটা নির্ধারণ করা মুশকিল। মাথায় সামান্য টাক। দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত। চামড়ার রঙ দুধে আলতা। হাফ হাতা গেঞ্জি ও সাদা রঙের ধুতিই তার পরিধানের বস্ত্র। এই বিশেষ বস্ত্রের বাইরে অন্য কোনো বস্ত্র আদৌও তার সংগ্রহে ছিলো কিনা সেটাও উদঘাটন করা অসম্ভব, কেননা মনীন্দ্রকে কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে দেখা যায় না। মনীন্দ্রের গলায় মোটা একটি স্বর্ণের চেইন। আর হাতে একটি ঘড়ি। মনীন্দ্রের নিকট আত্মীয় বলে কেউ নেই। দেশভাগের সময় মনীন্দ্রের বাবা-মা এই দেশে থেকে যান। তবে লতায়-পাতায় সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনের অঢেল খোঁজ পাওয়া গেল যখন মনীন্দ্রের বাবা-মা দুজনই কলেরা নামক রোগে স্বর্গবাসী হলেন। সেই সব আত্মীয় স্বজনদের অন্তরের প্রার্থনা যাই হোক না কেন- মনীন্দ্র সকল প্রকার "দূষিত বাতাস" রোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে দিব্যি বেঁচে আছেন। তাকে কোথাও যেতে দেয় না। টিনচালা ঘরের মধ্যেই তার সংসার। মনীন্দ্রের বন্ধু নেই। তবে সমগ্র মুখ দাড়িগোঁফে ঢাকা এক পাগল সন্ন্যাস ধরনের লোক বাস করে তার সাথে। সাধু সন্ন্যাসদের ব্যাপারে মানুষের প্রবল আগ্রহ থাকলেও এই লোকটার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ ছিলো না। কেননা দেশ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সত্তরের নির্বাচনের পর পরই একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যা করছে বাঙালিদের। বাঙালিরা ঠিকানা খুঁজছে। তাদের কণ্ঠে উঠে এসেছে: তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।

সন্ন্যাসী চেহারার মানুষ কবে থেকে এবং কী কারণে মনীন্দ্রের চায়ের দোকানের এক পাশে চট পেতে বসে থেকে হুঁকায় কী গড়গড় শব্দ করে টেনে যাচ্ছে, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ময়লা-জীর্ণ স্বল্প পরিধান বস্ত্রে আবৃত সন্ন্যাসী কোনো কথা বলে না। পাউরুটি আর দুধের সর। সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত খেয়ে যায়। সম্ভবত এই বাক্যহীন কর্মহীন সংসার নামক যাবতীয় যন্ত্রণার দায়িত্বমুক্ত সন্ন্যাস প্রকৃতির মানুষটিই তার বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত। মনীন্দ্রের চায়ের দোকানের

আর্কষণ তার হাতের ধোঁয়া তোলা গাঢ় লিকারের চা কিংবা রেডিও। নানা রকম বিষয়ের আড্ডা। তার চাইতে বড় আর্কষণ হলো কাঠের চেয়ারটি। নতুন কোনো খদ্দের এলে মনীন্দ্র মিষ্টি কণ্ঠে চেয়ারটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, "এই চেয়ারটিতে আমাদের জাতির পিতা বসেছিলেন।" জাতির পিতা এইখানে এসেছিলেন? বিস্ময়ভরা কণ্ঠের এই প্রশ্নটি মনীন্দ্রের ভালো লাগে। তিনি অহংকারী কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ। বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন। তিনি চেয়ারটিতে বসেছিলেন।

কবে? কখন?

স্বল্পভাষী মনীন্দ্র তখন সন-তারিখ উল্লেখ করেন। বলেন, নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় তিনি সাঁথিয়ায় এসেছিলেন। আমার দোকানে এসে চা খান। আমি তাঁকে চা বানিয়ে দেই। আহ! কী সুন্দর দেখতে! কী বিশাল মনের মানুষ। যেমন চেহারা তেমন তার মন! মনীন্দ্রের কাছ থেকে ইতিহাস জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, সবাই কান ফেলে শোনেন। এই অঞ্চলে কারা কারা যুদ্ধ করেছেন, কারা কারা যুদ্ধ ঝামেলায় না গিয়েও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আছেন, সবই জানেন। তবে এ ব্যাপারে বলতে পারেন না! নানা রকম মানুষ তার দোকানের কাস্টমার। আম-জনতা মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার সবাই এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। বঙ্গবন্ধু তার বিরাট মনের ক্ষমতায় রাজাকারদের যখন ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তিনিই বা বলার কে? স্বাধীন দেশে সবাই এখন দেশের মালিক। মিলেমিশে দেশ গড়ার জন্য সবাইকে কাজ করার জন্য বঙ্গবন্ধু কোনো বিভেদ চাননি। মনীন্দ্র লাল সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার দিকে তাকিয়ে ভাবেন, এই পতাকাটি বঙ্গবন্ধুর কারণে আমরা পেয়েছি। পাকিস্তানিদের শোষণ নিপীড়নের কথা মানুষ হয়ত কখনোই ভুলতে পারবে না। অথচ তার চায়ের দোকানে বিচিত্র স্বভাবের মানুষ কাস্টমার হয়ে আসে। নানা উদ্ভট গল্প জুড়ে দেয়। মনীন্দ্র তাদের কারো কারোর দিকে তাকিয়ে গোপনে হাসেন। এরা কেমন মানুষ? এই মানুষেরা নিকটবর্তী ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটা অজগরের মতো ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করেন। তাদের কি ইতিহাস জানা নেই? ইতিহাসের এই অংশটা তিনি বলেন না। তার ইতিহাস হলো বঙ্গবন্ধুর আগমন। তার সেই চেয়ারে আসন গ্রহণ ও তার মতো অতি নগণ্য একজন চায়ের দোকানদারকে মমতা দিয়ে ডাক দেয়া। যেন কত দিনের পরিচয়। বঙ্গবন্ধুর ভরাট কণ্ঠের ডাক "এই মনীন্দ্র, তোমার হাতের এক কাপ চা খাওয়াও তো!" চেয়ারটি ধন্য। দোকানটি ধন্য। মনীন্দ্রও ধন্য।

স্বাধীন দেশে চায়ের খদ্দের বাড়তে থাকে। কিছু মানুষের হাতে নগদ টাকা চলে আসে। মজুতদাররা ধুমছে ব্যবসা করে চা খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলে। রাস্তাঘাট মেরামতের টাকা আসে, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকা আসে, মানুষ শিক্ষিত হতে থাকে। বড় বড় চাকুরি পায়। চা খাওয়ার অভ্যাস দ্রুত বেড়ে যায়। ঠিকাদার, দাদন ব্যবসায়ী সরকারি কর্মকর্তারা দ্রুত ভদ্রলোক হয়ে ওঠে। মনীন্দ্র স্বল্পভাষী, তিনি ঐসব লোকদেরকে বঙ্গবন্ধুর চেয়ারটার ইতিহাস শোনাতে চেষ্টা করেন না। তবে তিনি কেবল একটি ব্রত পালন করেন। "বঙ্গবন্ধুর এই চেয়ারটাতে আর কেউ বসতে পারবে না।" তার এই চায়ের দোকানে কাঠের চেয়ারটি যাদুঘরের দুর্লভ সম্পদের মতো। মাঝে মধ্যে ধুতির আঁচল দিয়ে তিনি চেয়ারটা পরিষ্কার করে নিজে একটা কাঠের টুলে বসে পাহারা দেন। কিছু পাবলিক ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করে। তারা মনীন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলে, "গনেশটাকে যত্ন নাও না, চেয়ারটার এতো যত্ন ক্যা?" মনীন্দ্র কঠিন স্বরে বলেন, আপনি এই দোকানে আর আসবেন না। যান! যারা চেয়ারটির মর্যাদা দিতে পারেন না তাদেরকে আমি চা খাওয়াতে পারব না! মনীন্দ্রের এই কঠিন আচরণের কথা এলাকার সবাই জেনে থাকলেও সাঁথিয়া থানার নবাগত তরতজা স্বাস্থ্যের দারোগা বাবু জানতে পারে নাই। একদিন মেদবহুল বাঙালি দারোগাটি হুট করে মনীন্দ্রের দোকানে ঢুকে পড়ে এবং কিছু বোঝার আগেই সে চেয়ারটাতে বসে পড়ে। পায়ের উপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে ব্রিস্টল সিগারেটে আগুন ধরিয়ে টানতে থাকে। মনীন্দ্র আঁতকে ওঠেন। তিনি রূঢ় গলায় বলেন, একি! আপনি এই চেয়ারে বসছেন কেন? ওঠেন ...

নতুন কোনো খদ্দের এলে মনীন্দ্র মিষ্টি কণ্ঠে চেয়ারটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, "এই চেয়ারটিতে আমাদের জাতির পিতা বসেছিলেন।" জাতির পিতা এইখানে এসেছিলেন? বিস্ময়ভরা কণ্ঠের এই প্রশ্নটি মনীন্দ্রের ভালো লাগে।

খাকি কাপড় পরিহিত মোটা উপরি পাওয়া চাকুরে দারোগাবাবু ভ্রু কুঁচকে মনীন্দ্রের দিকে তাকায়। এই ব্যাটা উন্মাদ নাকি! কর্কশ কণ্ঠে বিশ্রি শব্দ প্রয়োগে বলে, "এই হালারপুত! চিল্লাইচোস কেন?" মনীন্দ্র ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন, এই চেয়ারে বঙ্গবন্ধু বসেছে। এই চেয়ারটাতে আমি আর কাউকে বসতে দেই নাই। বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এই চেয়ারটি আমি আর কাউকে বসতেও দেব না! হট্টগোল বেঁধে গেল। দেশের অবস্থা তখন ভালো না। চারিদিকে খাদ্যের চরম অভাব। নানা রকম গুজব আকাশে বাতাসে ছড়ানো ছিটানো। এক শ্রেণির মানুষের মুখে কুৎসিত হাসি। অনেকেই নানা রকম কুকর্ম করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে সত্যমিথ্যার গোলক ধাঁধায়। আর রহস্যজনকভাবে প্রায় সকলেই একই মুখোশের গভীরে মানুষের শরীর জুড়ে ভয়ানক অসুখ ছড়িয়ে গেছে। দারোগাকে চেয়ার ছেড়ে দিতে হলো। দারোগার শরীরে ক্রোধের ঢেউ শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা তাকিয়ে দেখল সন্ন্যাস ধরনের এক পাগলও তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এ এক ভীষণ লজ্জা!

এর কিছুদিন পর মনীন্দ্রের রেডিওতে প্রচার হলো এক সরকারি কর্মকর্তার কণ্ঠ। মনীন্দ্র নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। এও কি সম্ভব? বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে! একজন জাতির পিতা! একজন দেশ রূপকার। একজন মহান মানুষকে! মনীন্দ্র বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর মতো তিনিও নির্বিকার। সন্ন্যাস চেহারার পাগল লোকটি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল "বিপদ! ভীষণ বিপদ!" মনীন্দ্রের মুখে হাসি নেই। রেডিও বন্ধ। খবর শুনতে মন চায় না। নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘষির আগুনের তাপে দুধ ফোটায়। পানি টগবগ করে। চা বানায়। মানুষ চা পান করে। হাসিতামাশা করে। সে বেদনাহত চিত্তে মানুষের দিকে তাকায়। এই কী মানুষ–এদের জন্যই বঙ্গবন্ধু বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানিদের সামনে বুক পেতে দিয়েছেন। দেশ স্বাধীনের পর পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন এদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অর্থ জোগাড় করতে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সর্বস্ব দিয়েছেন। তারপর একদিন দুপুরে দারোগা বাবু মনীন্দ্রের চায়ের দোকানে চারজন কনস্টেবল নিয়ে এলো। তার মুখে চাপা হাসি। সে চেয়ারটাকে টেনে রাস্তার পাশে নিয়ে এলো। আরাম করে বসলো। পায়ের উপর পা তুলে একটা একটা সিগারেট ধরালো। পাবলিক দেখছে। পাবলিক পাথরের মতো নিশ্চল। ভাষাহীন। তাদের ভেতর অজানা অচেনা ভয়! শত্রুমিত্র না চেনার ভ্রান্তি! কিংবা মানুষের ভেতরে দগদগে অসুখ, কারো কারো অন্তরে অবর্ণনীয় ক্ষত। বাকরুদ্ধ। দারোগা অট্টহাসি দিয়ে ডাকছে, "এই মনীন্দ্র মালাউনের বাচ্চা!" প্রখর রোদে রাস্তার ধুলোয় মোটা চামড়ার তৈরি বুটের সজোর আঘাতে ছিটকে গেল মানুষটি। ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠা সেই মানুষটি আর্ত চিৎকারে বললেন, নামেন ঐ চেয়ার থেকে! ওটা জাতির পিতার চেয়ার ...

মনীন্দ্রের চায়ের দোকানটির ঝাঁপ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর একদিন উৎসুক জনগণ সেটাকে খোলার চেষ্টা করল এবং এই সময় লতাপাতার মতো দূর সম্পর্কীয় যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন নানা পদের হা-হুতাশ করতে লাগল! আহ! মনীন্দ্র কোথায়? লোকটা কোথায় গেছে! মনীন্দ্রের চায়ের দোকানের রেডিওটি নেই। জনগণ মনীন্দ্রের দোকানের ভেতর কত কিছু খুঁজতে লাগল। তার এক আত্মীয় বলল, এই দোকানে একটি লোহার সিন্দুক ছিলো। সেটি কোথায়? মূর্খ জনগণের কৌতূহলের সীমা নেই। সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ তাহলে কোথায় রেখেছিলো সে? পাগলের সাথে থেকে সে আসলে পাগলই ছিলো। আলমিরার ড্রয়ারগুলো খোলা হলো। ধুলোবালি পোকামাকড়ে ভরা দীর্ঘদিনের জমে থাকা অন্ধকারটাই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে এলো ...

নিরুদ্দেশ মনীন্দ্রের বিবির আত্মীয় স্বজনদের সকরুণ আহাজারিতে সাঁথিয়া বাজারের বাতাস খানিকটা ভারি হয়ে উঠল। মনীন্দ্রের বিপুল অর্থ-সম্পদের হদিস নেই। এত এক বড় দুঃখের সংবাদ। নাকি সন্ন্যাস ধরনের পাগলটাই সব লুট করে নিয়ে গেছে। সন্ন্যাস ধরনের লোকটিকে আর কোনদিন দেখা গেল না। মনীন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার সাথে সাথে তার স্থাবর-অস্থাবর নানা সম্পদের বৈধ দাবিদারের সংখ্যা এতোই বেড়ে গেল যে, তার ঝাঁপ তোলা টিনের ঘরটির দখল নেওয়ার ঘটনায় নানা ঘটনা ঘটতে থাকে।

গল্পকার: সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা।

চেতনার উৎস – শেখ মুজিব

সৈয়দ লুৎফর রহমান

'৬০-এর দশকে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম বলে বেশ কয়েকবার বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর চট্টগ্রামে সফর, আর একাত্তরের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই ঐতিহাসিক জনসভায়, যা আমার পরবর্তী জীবনে চলার পথে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ঐ দুই দিনের স্মৃতি আমার হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর চট্টগ্রাম সফর

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চট্টগ্রাম আসবেন। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় ছাত্রলীগের তরফ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে অভিষিক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু উপাধি মূলত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক মোস্তাকের চিন্তাপ্রসূত। রেজাউল হক মোস্তাক তাঁর এক লেখায় শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে বঙ্গবন্ধু শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় তোফায়েল আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

দীর্ঘ কারাভোগের পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম চট্টগ্রাম সফর। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গন সরব হয়ে উঠল। সবাই আনন্দমুখর। চারিদিকে সাজসাজ রব। শেখ মুজিব বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে আগ্রাবাদ হয়ে হোটেল শাহজাহানে উঠবেন। সন্ধ্যায় হোটেল শাহজাহানের হলরুমে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। বিভিন্ন সংগঠন সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা ছাত্রলীগের আগ্রাবাদ শাখার নেতা-কর্মীরা বৈঠকে মিলিত হলাম। সিদ্ধান্ত হলো, আগ্রাবাদ চৌমুহনীতে একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হবে। বাঁশ ও ছন দিয়ে খড়ের ঘরের আকৃতির মতো হবে সেই তোরণ, যা গ্রামবাংলার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবে। তোরণের পাশে ছাত্র-গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় শাহজাহান হোটেলের সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধুকে ছাত্রলীগের পক্ষ হতে মানপত্র প্রদান করা হবে। মানপত্র রচনার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। সংবর্ধনা সভায় তা পড়তেও হবে আমাকে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কাজে নেমে পড়লাম। আমার রক্তে এক উষ্ণ শিহরণ বয়ে গেলো। একদিকে সংবর্ধনাসভায় স্বরচিত মানপত্র পাঠের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের আনন্দ, অন্যদিকে মানপত্রের মান ও উপস্থাপনা নিয়ে বুকের ভেতরে দুরুদুরু সংশয়। রাত জেগে অবশেষে মানপত্রটি লিখে ফেললাম। কবিতার আদলে মানপত্র। সন্ধ্যায় যথাসময়ে হোটেল শাহজাহানের হলরুমে সংবর্ধনাসভার কাজ শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু এসে একটি সোফায় বসলেন। তাঁর পাশে আওয়ামী লীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা, বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক জনতার সাংবাদিক আবদুস সালাম। আমি বঙ্গবন্ধুর ঠিক ডান পাশ ঘেঁষে

দাঁড়িয়ে ছিলাম। চট্টগ্রাম শহর ও জেলা শাখার আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে গোটা হল পরিপূর্ণ হয়ে করিডোর পর্যন্ত বিস্তৃত। নেতাকে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। এরপর মানপত্র পাঠের পালা। উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে আমাকে মানপত্র পাঠে উৎসাহিত করল। আমি নিঃসঙ্কোচে মানপত্রটি পাঠ করলাম। শেখ মুজিবকে 'হে বঙ্গ শার্দূল' সম্বোধন করে মানপত্রটি শুরু হয়েছিল। বর্ণনায় এসেছিল বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, অবহেলা, গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সবশেষে ছিল– 'মুক্তির জন্য চাই স্বাধীনতা'। করতালিতে মুখরিত হলো সম্পূর্ণ হল। শেখ মুজিব উঠে দাঁড়ালেন। সাগ্রহে মানপত্রটির জন্য হাত বাড়ালেন। মানপত্রটি তার হাতে তুলে দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিপ্লবী-বিপ্লবী বলে দুই-তিনবার তিনি আমার পিঠ চাপড়ালেন। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। আনন্দের এক অভূতপূর্ব শিহরন ছড়িয়ে পড়ল আমার সমস্ত শরীর জুড়ে। শিরা-উপশিরায় রক্ত টগবগ করতে লাগলো। শেখ মুজিব পাশে উপবিষ্ট সাংবাদিক আবদুস সালাম সাহেবের হাতে মানপত্রটি তুলে দিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানোর জন্য বললেন। মানপত্রটি হলভর্তি অধিকাংশ নেতা-কর্মীকে আলোড়িত করলেও কয়েকজন নেতা যে খুশি হতে পারেননি তা তাদের অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছিল। এরা ৬ দফার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। উল্লেখ্য, বাঙালির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হবে, নাকি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে– এই প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে ২টি ধারা স্পষ্ট ছিল। আ.স.ম আবদুর রব, শাহাজাহান সিরাজসহ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধিকাংশই স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে স্বপন কুমার চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, চিশতি হেলালুর রহমান, আ.ফ.ম মাহবুবুল হক, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, গোলাম ফারুক, রায়হান ফেরদৌস মধু, বদিউল আলম, সাইফুল গণি চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, আফতাব আহমেদ, আবদুল বাতেন চৌধুরী, খান মজলিশ, জহুর আহম্মদ, নজরুল ইসলাম, মমতাজ বেগমের নাম উল্লেখযোগ্য।

৭ই মার্চের ভাষণ

৫ মার্চ প্রথমে বঙ্গবন্ধু বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) হাইকমান্ড সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ৬ মার্চ পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ৬ তারিখ রাত ১২টায় পরবর্তী দিনের ভাষণ চূড়ান্ত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুগান্তকারী ভাষণ স্মারক হিসেবে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অনেক উৎকণ্ঠা, সন্দেহ, কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে জাতি একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পেয়ে গিয়েছিল। মার্চের দিনগুলোতে ঘটনার এতো দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন হচ্ছিল যে–যে কোনো দিন, যে কোনো সময়, যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারতো। কারো ঘোষণার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ অপেক্ষা করবে না। এ সময়ে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা বুঝতে বিভ্রান্ত হওয়ারও কথা নয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ আন্দোলনের চরিত্র ও রূপগত পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ইতিহাসখ্যাত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শুধু সশস্ত্র আন্দোলনের আহ্বানই নয়, জাতির মুক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও

করণীয় সম্পর্কেও এটি ছিল নেতার চূড়ান্ত বার্তা। চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সামনের দিনগুলোতে কখন কোন পরিস্থিতিতে জাতিকে কী করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল এ ভাষণে। সেদিনের পটভূমিতে যারা এ ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছিলেন, আমার বিশ্বাস, পরবর্তী দিনগুলোতে আমাদের যে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে– এই বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

৭ মার্চ। দিনটি ছিল রবিবার। হরতাল চলছিল। টঙ্গী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ– দূরবর্তী এসব স্থান থেকেও হাজার হাজার মানুষ মিছিল সহকারে ঢাকার পথে। গন্তব্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। জনতার যুদ্ধংদেহী মনোভাব। সবার মুখে উচ্চারিত হচেছ 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'। 'পিন্ডি না ঢাকা–ঢাকা ঢাকা'। সমগ্র ঢাকা শহর পরিণত হলো মিছিলের নগরীতে। বিরামহীন স্রোতের মতো মানুষ আসছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। কারো হাতে বাঁশের লাঠি, কারো-বা হাতে নৌকার বৈঠা। শ্রমিকের হাতে লাল ঝাণ্ডা। মাথায় লাল ফিতা। রাজপথে নেমে এসেছে ছাত্র-শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক, গায়ক-নাট্যকর্মী, কারখানার শ্রমিক, খেতের কৃষক, নৌকার মাঝি, দিনমজুর, দোকানের কর্মচারী, এমনকি প্রতিবন্ধীরাও।

আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল এ ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হওয়ার। দিন বাড়ার সাথে সাথে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সবুজ চত্বর লোকে-লোকারণ্য। জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে বিশাল উদ্যান। চারিদিক স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত। মাঠ জুড়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আমরা প্রায় ২০-২৫ জন মঞ্চ ঘিরে বিরামহীনভাবে স্লোগান দিতে শুরু করলাম। চেনা-জানার মধ্যে যে কয়জন বিপ্লবী কর্মী সেদিন স্লোগানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আ ফ ম মাহবুবুল হক, বদিউল আলম, গোলাম ফারুক, রায়হান ফেরদৌস মধু, চিশতি হেলাল, মোস্তাফিজুর রহমান, আহমদ রফিক, সাইফুল গণি চৌধুরী, মহিউদ্দিন বুলবুল, আবদুল বাতেন চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, রেজাউল হক মোস্তাক উল্লেখযোগ্য। স্লোগানের ভাষা ছিল–'বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধরো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'। 'সব কথার শেষ কথা–বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। 'জয় বাংলা'। মাঝে মাঝে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ–কায়েম কর' স্লোগানটিও দেয়া হয়। মঞ্চের দুই পাশে ছাত্রলীগের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী। সামনে মেয়েরা। জনতা অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষায়। কখন আসবেন নেতা! কখন আসবেন বঙ্গবন্ধু! কী-ই বা বলবেন! স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন কি? বিকাল ২০টা ৪৫ মিনিটের দিকে শেখ মুজিব এলেন। বেশ চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। বিশাল জনসমুদ্রে নেমে এলো নীরবতা। পিনপতন, শব্দবিহীন।

বঙ্গবন্ধুর আঠারো মিনিটের বক্তৃতায় রচিত হলো ইতিহাসের এক মহাকাব্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতার মধ্যে অন্যতম। বক্তৃতা শুরু হয়েছিল সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে–দেশের এখানে সেখানে নিরীহ জনতার ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন, রাস্তায় রাস্তায় লাশ, রক্তাক্ত রাজপথ, পাকিস্তানিদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, ভুট্টো-ইয়াহিয়ার গোপন আঁতাত–কোনকিছুই বাদ পড়ল না। অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম– আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। জাতির করণীয় সম্পর্কে চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'–এ আহ্বানের পরতে পরতে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য করণীয় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি বার্তাই ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে কোনো সময় গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে কী করতে হবে সে নির্দেশও দিয়েছেন। এ ভাষণের পর পূর্ব ও পশ্চিমের বাঁধনের দুর্বল সুতাটিও অবশেষে ছিঁড়ে গেল।

আমি নিঃসঙ্কোচে মানপত্রটি পাঠ করলাম। শেখ মুজিবকে 'হে বঙ্গ শার্দূল' সম্বোধন করে মানপত্রটি শুরু হয়েছিল। বর্ণনায় এসেছিল বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, অবহেলা, গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সবশেষে ছিল– 'মুক্তির জন্য চাই স্বাধীনতা'। করতালিতে মুখরিত হলো সম্পূর্ণ হল। শেখ মুজিব উঠে দাঁড়ালেন। সাগ্রহে মানপত্রটির জন্য হাত বাড়ালেন। মানপত্রটি তার হাতে তুলে দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিপ্লবী-বিপ্লবী বলে দুই-তিনবার তিনি আমার পিঠ চাপড়ালেন। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। আনন্দের এক অভূতপূর্ব শিহরন ছড়িয়ে পড়ল আমার সমস্ত শরীর জুড়ে। শিরা-উপশিরায় রক্ত টগবগ করতে লাগলো।

৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক দিনের চিত্র কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর কবিতায় বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। কবিতাটি পাঠে আজকের প্রজন্মের কাছেও দিনটি খুব সহজে অনুমেয় হবে।

কবি গুণ 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় লিখেছেন:

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য
অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী
শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে:
"কখন আসবে কবি?"

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকদের শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার বাঙালি মানসে শুধু ঘৃণারই জন্ম দিয়েছে। সে ঘৃণা থেকে সৃষ্ট ক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে বাঙালির মুক্তির ও স্বাধীনতার ঘোষণা।

লেখক
জিএম (মানবসম্পদ বিভাগ), সিদীপ

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবিকতা

সালেহা বেগম

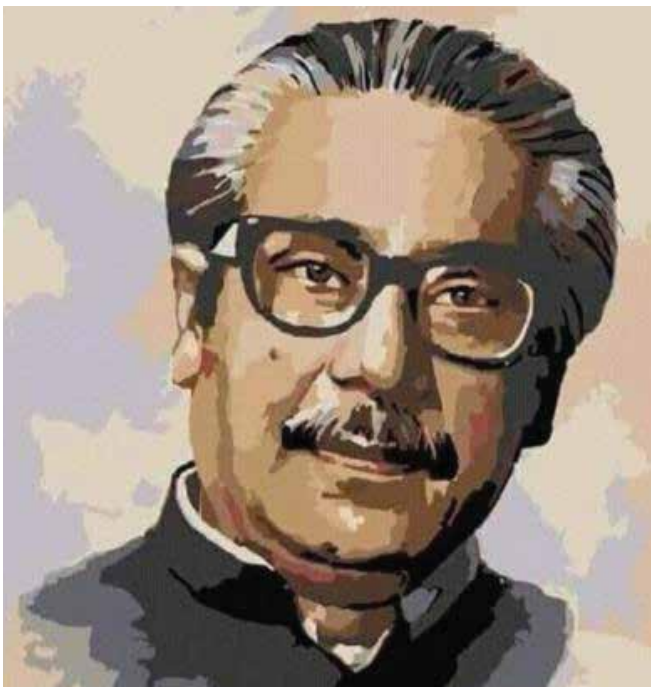

বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের ছাত্র তখনই। স্কুল পরিদর্শনে আসেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলবল নিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে কাছেই ডাকবাংলোর দিকে যাচ্ছিলেন। কিছু দূরে দেখা গেল বেশ কয়েকজন ছাত্র রাস্তা আটকে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ওদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, তোমরা কি চাও? ছাত্রদের মধ্য থেকে লম্বা, চোখে চশমা, একজন বেশ দৃঢ় ও নির্ভিক কণ্ঠে জানাল, 'আমাদের স্কুল হোস্টেলের ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে অনবরত পানি পড়ে, এতে আমাদের বই-খাতা, বালিশ, তোষক ও লেপ ভিজে যায়। তাই হোস্টেলের ছাদ মেরামত করার ব্যবস্থা না করলে পথ ছাড়ব না।'

প্রধানমন্ত্রী ছাদ মেরামত করতে কত টাকা লাগবে জানতে চাইলেন। ছেলেটির দৃঢ় কণ্ঠে জবাব: ১২০০ টাকা। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁর তহবিল থেকে ১২০০ টাকা মঞ্জুর করে দিলেন এবং উপস্থিত থাকা এসডিও সাহেবকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুল-হোস্টেলের ছাদ মেরামতের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ছেলেটিকে কাছে ডেকে স্নেহের সুরে বললেন, তোমার সৎ সাহস এবং যথাযথ উত্তরে আমি খুশি হয়েছি। পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘটনাটি অবলোকন করলেন। তিনি ছিলেন ঝানু রাজনীতিক, তাই বুঝতে পারলেন ছেলেটিকে ঠিকভাবে সহযোগিতা করলে সে ভবিষ্যতে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ডাকবাংলোয় পৌঁছে তিনি পিয়নকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠান। দুজনে নানা আলাপ-আলোচনা করলেন। বিদায় নেওয়ার সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছেলেটিকে নিজের ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলে দেখা করতে বললেন।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিব ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে তাঁর দেয়া ঠিকানায় দেখা করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবের সাথে দেশের রাজনীতি ও রাজনীতির নানা কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের কাছে শেখ মুজিব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর জনপ্রিয়তার খবরে আনন্দ অনুভব করেন। সেই থেকে শেখ মুজিবের সাথে সোহরাওয়ার্দীর গুরু-শিষ্যের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ হলেও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের সংঘাত দুজনার মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে।

সে সময় প্রদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন 'আজাদ' পত্রিকার মওলানা আকরাম খাঁ এবং সেক্রেটারি ছিলেন বর্ধমানের আবুল হাশেম। তখন মুসলিম লীগ দুটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দিন ও

মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ, অন্যটি শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে প্রগতিশীল গ্রুপ। মুসলিম লীগ ভাগ হওয়ার কারণে ছাত্রলীগও বিভক্ত। শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক গ্রুপ নাজিমুদ্দিনের সমর্থক; শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আরেক গ্রুপ সোহরাওয়ার্দী-হাশেম গ্রুপকে সমর্থন করে। তখন ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বেশ কথা কাটাকাটি হয়। আনোয়ার হোসেনকে পদ দিতে শেখ মুজিব ঘোরতর আপত্তি জানান। তাঁর যুক্তি, আনোয়ার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভালো কর্মীদের জায়গা দেয় না, হিসাব-নিকাশও ঠিকমত দাখিল করে না। এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী মুজিবের জেদ দেখে রাগ করে বলেন, তুমি কে? তুমি কেউ না। শেখ মুজিব জবাব দিয়েছেন, আমি যদি কেউ না হব আমাকে এখানে ডেকেছেন কেন? আমাকে অপমান করার কোন অধিকার আপনার নাই। ধন্যবাদ স্যার, বলে বৈঠক ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বুঝতে পারেন এত শক্ত কথা বলা তাঁর ঠিক হয় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আরেকজন ছাত্রনেতাকে পাঠালেন মুজিবকে ফিরিয়ে আনার জন্য। নিজেও দোতলা থেকে মুজিবকে ফিরে আসতে বলেন। শেখ মুজিব ফিরে আসার পর তাঁকে বলেন, 'যাও, তোমরা ইলেকশন করো। দেখো নিজেদের মধ্যে গোলমাল করো না।' এরপর শেখ মুজিবকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই এ কথা বলি নাই, তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলে তোমাকেই বলেছি।'

শেখ মুজিবের ভাষায়, 'তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ ও সর্বস্তরে এর প্রচলনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন লেখা থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ।

সেই দিন থেকে আমার জীবনে প্রত্যেকটা দিনই তাঁর স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘ সময় আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তাঁর স্নেহ থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই।'

১৯৪৩ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে অনেক লোক মারা যায়। সে সময় শেখ মুজিবকে প্রাদেশিক মুসলিম কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী করা হয়। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন, 'দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছুতেই জনগণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছেমিছি বদনাম নিবেন।' সোহরাওয়ার্দী সাহেব জবাবে বলেছেন, 'দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না।' ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পান, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দিলেন এবং দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবস্থার ভয়াবহতা অবহিত করে সাহায্য দেয়ার অনুমোদন চাইলেন। অনতি বিলম্বে বজরায় করে চাল, আটা, গম আনা শুরু হলো। তাঁর নির্দেশ ছিল, কোন মানুষ যেন না খেয়ে মারা না যায়। শেখ মুজিব যে কতখানি সততা ও নিষ্ঠা ভরে এ দায়িত্ব পালন করেছেন তা তাঁর লেখাতেই প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন, 'আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গ্রামে গ্রামে অনেক লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে ওদের খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিস, কলকাতা মাদ্রাসাসহ আরো অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, রাতে কোনদিন বেকার হোস্টেলে ফিরতাম, কোনদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।'

১৯৫৮ সালের এপ্রিলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দেন। তিনি তখন ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন শেখ মুজিব হলো একটি হীরের টুকরা, যাকে সামান্য দিকনির্দেশনা দিতে পারলেই পূর্ববাংলা এক বলিষ্ঠ নেতা পাবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওই বছরই

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে শেখ মুজিবকে ইউরোপ- আমেরিকার বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সফরে পাঠাবার প্রস্তাব দেন যাতে পশ্চিমা রাজনীতি ও অর্থনীতির রূপরেখা সম্পর্কে তিনি ধারণা গ্রহণ করতে পারেন। প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দুই মাসের ট্যুরের সময় শেখ মুজিব বেশি সময় (১২ দিন) কাটিয়েছেন লন্ডনে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় ভারত বিভক্তির বিষয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, সে সময় শেখ মুজিব ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। তখন তাঁকে চলতে হয়েছে বেশ কজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে। তাঁরা ছিলেন, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রাজ্ঞ এই রাজনীতিবিদদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বলয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্য তাঁকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র প্রেক্ষাপট অলোচনায় উল্লেখ করেছেন, 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট কোঠায় বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল, কেমন করে তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম, কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম।'

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অনন্য একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন ভাষা আন্দোলনের তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশে প্রথম সফল হরতাল। এই হরতালে নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেয়ে বাঙালিরা নতুন করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তার আজ্ঞাবহদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকবে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন উৎসবে ঘোষণা দেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণের পর এই চেতনাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। পরবর্তী সময়েও তিনি বাংলা ভাষা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অধিকারের দাবির কথাগুলো আরও জোরালো উচ্চারণে জাতির সামনে তুলে ধরেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বাংলা ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ ও সর্বস্তরে এর প্রচলনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন লেখা থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ।

১৯৬২ ও শিক্ষা আন্দোলন, '৬৪ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন, '৬৫ ও মৌলিক গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এইসব কর্মকাণ্ডের স্রোতে বঙ্গবন্ধু দলীয় ও ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি শত বিরোধিতা, কারাবাস, নির্যাতন উপেক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে নেন। শাসকগোষ্ঠী তাঁকেসহ বাঙালি আমলা, সেনাবাহিনীর মেধাবী সদস্য, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের ফাঁসানোর জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ছাত্র সমাজ ১১ দফা দাবিতে রাজপথে নামে। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু '৭০এর নির্বাচনকে 'ছয় দফার প্রতি গণভোট' হিসাবে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে না দিয়ে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। আবার বাঙালিরা রাস্তায় নেমে আসে, প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু রাজনৈতিক ভাষণ নয়, কূটনৈতিক ভাষণও বটে। এর মাধ্যমেই তিনি জাতিকে স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা দেন এবং ২৬শে মার্চ ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। তাঁর সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বকে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

সবশেষে বলতে চাই, বাঙালির চিন্তাভাবনায় ভরসার কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ও থাকবেন। স্নেহ-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও উদারতার নজির এই বাংলার আবহমান সংস্কৃতিতে ছিল বলেই আমরা পেয়েছিলাম এমন নেতা। তাঁর আদর্শ, রুচিবোধ, উদারতা, দেশপ্রেম ইত্যাদিকে আমাদের ধারণ করতে হবে, তবেই আমরা এগোতে পারবো।

লেখক ও গবেষক

কথার অমরত্ব ও স্থপতি বঙ্গবন্ধু

মাহ্‌ফুজ সালাম

অনেকেই বলে থাকেন কথাই অমৃত, কথাই তেতো। কথা শুধু কথা নয়, কথা একধরনের শিল্পও বটে। কথা নিয়ে নানান কথা, যারা কাজের মানুষ, চিন্তাশীল তাদের কথা হলো 'কথা কম কাজ বেশি'। এ ছাড়াও অফিস আদালতে গিয়ে যতকথাই বলেন ওখানে 'খালি কথায় চিড়া ভিজে না'। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি কথা যারা বলেন তাদের বলা হয় বাচাল। এ কথাও গ্রামগঞ্জে প্রচলিত আছে 'কথায় কথা বাড়ে মন্থনে বাড়ে ঘি'। এর উল্টোটাও আছে, যে কথা বলতে পারে না তাকে আমরা বোবা বলি, কথায় বলে, বোবার কোন শত্রু নাই। হালে বোবারাও শত্রুর মুখে পড়ে। মুখের কথা আর ধনুকের তীর দুটো একই রকম। দুটোই বের হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। কথার অনেক মারপ্যাঁচ। সুতরাং কথা সব সময়ই ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে বলা উচিত। ধৈর্যশীলরা শুনে বেশি, বলে কম। কবিগুরুর কথায় সহজ কথার মর্মার্থ অনেকটা এ রকম 'সহজ কথা বলতে মোরে কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। আর তাঁর গানের কথা 'অনেক কথা যাওগো বলে, কোন কথা না বলে।

ভণিতা রেখে এখন আসল কথায় আসি। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে রয়েছে হাজার বছরের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। ইংরেজদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসন আমলে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৃটিশবিরোধি মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। বৃটিশরাও সুচতুরভাবে ডিভাইড এ্যান্ড রুল নীতি অনুসরণ করে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করার কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশলের অংশ হিসেবে তারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য ১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যতের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এক ধরনের আশাবাদ জন্ম নেয়। মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মনে আলাদা একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখা দেয়। মুসলমান রাজনীতিবীদগণ আলাদা একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় চরমপন্থী নেতাদের প্রভাবে বাংলায় বৃটিশবিরোধি আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গে ঢাকাভিত্তিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

তৈরি হয় ও ঢাকার পূর্বগৌবর ফিরে আসে। অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নসহ কৃষিপণ্য পাটের চাহিদা এবং দাম বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমাদের সমর্থন থাকায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টি হয়।

এই আন্দোলন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কবিগুরু রবীদ্রনাথ এসময়েই অসংখ্য অনবদ্য স্বদেশী গান রচনা করেন। রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রাসাদ সেন, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ আবু মহম্মদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী সৃষ্টিশীল কাব্য ও সাহিত্য রচনা করে দেশপ্রেমের অমর কীর্তি রেখে যান। এ সময় মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান বৃটিশ সরকারের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দুই বাংলার লোকের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান নির্বিশেষে একে অপরের হাতে রাখি বাঁধেন। তদানীন্তন বাঙালিদের উদ্দেশ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি"।

অনেক পানি গড়িয়ে অবশেষে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হলো। পশ্চিমে পশ্চিমপাকিস্তান, পূর্বাংশে পূর্বপাকিস্তান, মাঝখানে বিশাল এক দেশ ভারত। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আনলাম পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী মুসলমানদের। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর হলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ঢাকায় এলেন ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চে। রমনার মাঠে বিশাল

এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলে ফেললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু এবং তিনি এ কথাও বলেন যে, যারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে তারাই হবে পাকিস্তানের শত্রু। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্ত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে গদগদভাবে বলে ফেললেন 'উর্দু, শুধু উর্দুই হবে এ দেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই একটি মাত্র কথাই পাকিস্তান ভাঙ্গার বীজ বপন করলো বাঙালিদের মনে। বাঙালির রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? ফুঁসে উঠলো ছাত্রজনতা, প্রতিবাদে ফেটে পড়লো দেশ। এই একটি বাক্যের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির সামনে জন্ম নিল ৫২র ভাষা আন্দোলন। বাঙালির রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সূর্যসন্তানরা শহীদ হলো, বাংলার বুকে জন্ম নিল স্বাধিকার আন্দোলন। ৫২র পথ ধরে গঠিত হলো ৫৪র যুক্তফ্রন্ট, ৬২র ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭০এর নির্বাচন। নির্বাচনে বাঙালি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল, কিন্তু ক্ষমতা পেল না। এ সব কিছুর পিছনে পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ, শাসন-শোষণ আর জিন্নাহ সাহেবের একটি বাক্যই ছিল যথেষ্ট। এতে বাঙালিদের বুঝতে বাকি ছিল না আগামী দিনে এ জাতির করণীয় কী।

৭০এর পর পাকিস্তানিরা বাঙালির হাতে ক্ষমতা ছাড়েনি, এতে জন্ম নিল একাত্তরের ৭ মার্চ। সেখানেও জাতির জন্য একটি মাত্র কথা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তার মুখ থেকে নিঃসৃত হলো এই অনবদ্য বাণী। একটি কথা একটি জাতিসত্তার জন্ম দিল। এই একটি কথার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হলো, ২ লক্ষ মা-বোন ধর্ষিত হলো। জন্ম নিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৯০ হাজার প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী হেরে গেল মিত্রশক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। কথা শুধু ছুঁড়লেই হবে না; স্থান, কাল, পাত্র ও সময় বুঝে কথা বলতে হবে।

সময়ে একটি কথা বললে যে কাজ হবে, অসময়ে হাজার কথা বললেও সে কাজ হয় না। এই একটি কথা শোনার জন্য বাঙালিদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৫টি বছর। বঙ্গবন্ধুকে জীবনযৌবনের ১২টি বছর কাটাতে হয়েছে জেল থেকে জেলে, ঘুরতে হয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামে, মিশতে হয়েছে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতা, মেহনতি মানুষের সাথে, জাতিকে প্রস্তুত করতে হয়েছে আত্মদানের জন্য। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে দাঁড় করাতে হয়েছে এক কাতারে। ৭ মার্চের ভাষণ নেতারা লিখে রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্য, কিন্তু তিনি লিখিত বক্তৃতা দেননি। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কোন লিখিত বক্তৃতা দিও না। তোমার দেশ, দেশের ইতিহাস, মানুষ ও মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সামনে যা করণীয়, সর্বোপরি তোমার বিবেক যা সায় দেয় তুমি তাই বক্তৃতায় বলবা। জাতির জনক এক মাহেন্দ্রক্ষণেই এক অপূর্ব আবেগে শুনালেন সেই বিশ্বখ্যাত উক্তি।

শেষ কথায় ফিরে আসি। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশ, ব্যাংকের ভল্ট শূন্য, একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দেশ, দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এক কোটি লোক শরণার্থী হয়ে ভারতে অবস্থান। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে প্রথম লন্ডন, তারপর ভারত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশের মাটিতে নেমেই অশ্রুসজল নয়নে প্রথমেই দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন, প্রতিবেশি ভারতের প্রতি অকৃত্রিম ভালাবাসা প্রকাশ করলেন, তারপর যে কবির গানকে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই কবির প্রতি পরম শ্রদ্ধায় বলেছিলেন "কবি গুরু তোমার বাণী আজ মিথ্যে হয়ে গেছে, বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে।"

এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ভুলেন নাই, তিনি ইতিহাসকে ভুলেন নাই। অপূর্ব আবেগে সেই বিশ্ব কবিকে বাঙালির জাতির জনক শুনালেন সেই বিশ্ববিখ্যাত উক্তি। ঐ একটি কথা বলতে পেরেছিলেন কবিগুরু এবং তার যথার্থ উত্তর দিতেই যেন বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কবিগুরুকে এই কথা বলে বঙ্গবন্ধু চোখের পানি ফেলে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বে এর দ্বিতীয় কোন নজির নেই। কবির জন্ম হয়েছিল এই কথা বলার জন্য এবং সেই কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য জন্ম হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর। এই একটি কথা প্রমাণ করতে এ জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যুগের পর যুগ। এক নদী রক্ত দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে বাঙালিরা বীরের জাতি। বাংলাদেশ আজ শত্রুমুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে।

কথা শুধু বললেই হবে না। কথা বলার উপযুক্ত সময় একটা বড় বিষয়, সময় বুঝে কথা বলা, মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি বুঝে কথা বলা। কথা ফিরিয়ে দেবার জন্যও অনেক সময় ধৈর্য ধরতে হয়, নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়, প্রস্তুতি নিতে হয় । প্রতিদিন এই ষোল কোটি মানুষের দেশে শত শত নেতানেত্রীইতো কথা বলছেন। সব কথাতেই কি মানুষ নড়েচড়ে বসে? না। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি সময় বুঝে সঠিক কথাটিই বলতে পেরেছিলেন। এ জন্যই তিনি এ দেশের স্থপতি, জাতির পিতা। তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন, থাকবেন। কিছু কিছু কথা আছে কালের জন্য হয়েও কালোত্তীর্ণ। বিশেষের জন্য হয়েও নির্বিশেষ। দেশের জন্য হয়েছে সমগ্র বিশ্বের।

ছড়াকার ও উন্নয়ন প্রশিক্ষক

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু

দেওয়ান মামুনূর রশিদ

বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কালজয়ী ইতিহাসের মহানায়ক। বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস ব্যাপক ও প্রসারিত। তাঁকে ঘিরে গবেষণা না করলে তাঁর জীবন ও কর্মের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো অনুভব করা সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও কর্মের সামগ্রিকতা জুড়ে রয়েছে মানব মুক্তির সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের শুরুর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৩৭ সালে তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য তাঁর এক শিক্ষকের সহযোগিতায় 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করলেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিচাল সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা উপকরণ কিনে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ছোট বয়সে তাঁর মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিয়েছে। ছাত্র থাকাকালীনই শেখ মুজিব তাঁদের বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন সংস্কারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিচ্ছবি।

সেসময় স্কুলে পড়াকালীন বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে প্রথম মামলার শিকার হয়েছিলেন। গোপালগঞ্জ মহকুমা থানার দারোগা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এসে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন শেখ মুজিব যেন পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, আমি থানায় গিয়ে বলব তাকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু শেখ মুজিব সততার চেতনায় এতটাই উজ্জীবিত ছিলেন যে, তিনি বললেন- না, আমি পালাবো না, লোকে বলবে আমি ভীতু, ভয়ে পালিয়েছি, আমাকে গ্রেফতার করুন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার না করে থানায় চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ পরে শেখ মুজিব নিজেই থানায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেই সময়ে তাঁকে সাতদিন কারাবরণ করতে হয়েছিল। তখন পুলিশ, সাধারণ জনতা এবং রাজনীতিকদের কাছে শেখ মুজিবের আদর্শ, সাহস ও চেতনা স্পষ্ট হয়েছে যে, আগামীতে সে হবে এক অবিস্মরণীয় নেতৃত্বের অধিকারী।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পরে শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে তিনি বক্তৃতা

তাঁর বই প্রীতির বিষয়ে কিছু না বললেই নয়, তিনি বইপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল স্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন, "যদি পারো একটু পড়ালেখা করবে, অবসরে বই পড়বে, আমিও অবসরে বই পড়ি।" কারাগার থেকে স্ত্রীকে বই পড়ার তাগিদ দেওয়া ব্যতিক্রমী রাজনীতিকের পরিচয়। ১৯৫১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা কারাগার থেকে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি শামসুল হক সাহেবের নিকট চিঠিতে লিখেছেন, "দু'এক খানা ভালো ইতিহাসের বা গল্পের বই পাঠাতে পারলে সুখী হব।" ডায়রিতে ইতিহাস লিখেছেন ও পড়েছেন অনেক বই।

দিলেন, বললেন ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে হবে। ভারতীয়দের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ব্রিটিশরা আমাদের অতিথি, তারা আমাদের শাসক হতে পারে না। তাঁকে বার বার গ্রেফতার হতে হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করায় বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। বাংলায় প্রদত্ত বক্তৃতার শুরুতে তাঁর দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্ব দরবারে মাতৃভাষায় বক্তৃতা প্রদান করে মূলত সারা পৃথিবীর মানুষের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান মজুতদারির বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করে কলকাতায় সমাবেশ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে নিকটবর্তী প্রার্থী মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে হারিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী ব্যয় বহন করার মত সামর্থ্য ছিল না। গোপালগঞ্জের মানুষ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের নেতাকে ভালোবেসে নির্বাচনী খরচ সংগ্রহ করেছিলেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয় এবং ১৯৭১এ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। এ বিষয়গুলো একই সূত্রে গাঁথা। স্বাধীনতার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাঁর বই প্রীতির বিষয়ে কিছু না বললেই নয়, তিনি বইপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল স্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন, "যদি পারো একটু পড়ালেখা করবে, অবসরে বই পড়বে, আমিও অবসরে বই পড়ি।" কারাগার থেকে স্ত্রীকে বই পড়ার তাগিদ দেওয়া ব্যতিক্রমী রাজনীতিকের পরিচয়। ১৯৫১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা কারাগার থেকে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি শামসুল হক সাহেবের নিকট চিঠিতে লিখেছেন, "দু'এক খানা ভালো ইতিহাসের বা গল্পের বই পাঠাতে পারলে সুখী হব।" ডায়রিতে ইতিহাস লিখেছেন ও পড়েছেন অনেক বই।

তাঁকে দেখেনি এমন কোটি কোটি বাঙালি কেবল তাঁর আহ্বানে স্বদেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের মধ্যে একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়েছে।

লেখক, সাংবাদিক ও আইনজীবী

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও একজন বাগদাদি বংশোদ্ভূত জ্যাকব

রঞ্জন মল্লিক

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সূচনা কাল ১৯৫২র একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হলেও পাকিস্তানে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় নির্বাচন হয় একবারই মাত্র ১৯৭০ সালে। ২৩ বছরের ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, প্রথাবিরোধী, শোষণ ও নির্যাতনমূলক। গণতন্ত্র ছাড়া একটি দেশ চলতে পারে না, পাকিস্তানের ভাঙ্গন তার একটি প্রকৃষ্ট নজির। সামরিক শাসনে ও বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে দেশ রক্ষা করা যায় না। এই সত্য বাক্যটি তারা অনুধাবন করতে পারেনি। আরো একটি সত্য, ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালিকে উল্টাপাল্টা বোঝানো কঠিন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে ইপিআরের ওয়ারলেস তরঙ্গের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে বীর বাঙালি মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারত পূর্বাঞ্চলিয় বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেন।

ভারতে এ সময় স্রোতের মতো পূর্ববাংলা থেকে শরণার্থীরা প্রবেশ করতে থাকেন। পাশাপাশি ভারতের মাটিতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, যে কোন সময় পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলের চিফ অব স্টাফ হিসেবে ছিলেন জে এফ আর জ্যাকব। তাঁর হেড কোয়ার্টার ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম। উল্লেখ্য যে, জ্যাকব কলকাতারই সন্তান। তিনি এই নগরিতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বাগদাদি ইহুদী ব্যবসায়ী। সুদূর বাগদাদ থেকে ভাগ্যান্বষণে ও ব্যবসার খাতিরে ভারতে আসে এই ইহুদি পরিবারটি।

জ্যাকবের পড়াশোনা কাশিয়াংয়ে। তিনি ধীর, স্থির ও তীক্ষ্ম মেধা সম্পন্ন ছিলেন।

স্কুল জীবনে ভাল ফলাফলের অধিকারী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি ও সমগ্র ইউরোপে ইহুদি নিধন শুরু হয়। নাৎসি বাহিনির হলোকস্টের খবর তাঁকে মর্মাহত করে। ১৯৪২ সালে তিনি ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনিতে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ২০/২১ হবে। ১৯৪৩ সালে আফ্রিকায় নাৎসি বাহিনির মোকাবিলায় তাকে প্রেরণ করা হয়। সেখানে নাৎসি জার্মান বাহিনিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন জে এফ আর জ্যাকব। পরবর্তীতে জ্যাকবের বাহিনিকে সেখান থেকে বার্মায় বদলি করা হয়। বার্মায় তাঁর ইউনিট জাপানি বাহিনির মোকাবিলা করেন যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত। এখানেও বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারত ত্যাগ করে এবং দেশকে দু খণ্ডে বিভক্ত করে রেখে যায়। পাকিস্তান ও ভারত নামে স্বাধীন দেশে জ্যাকব ভারতীয় সেনাবাহিনিতে যোগ দেন। বৈরি-প্রতিম দুই দেশ ১৯৬৫ সালে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় জ্যাকবের পোস্টিং ছিল ভারতের

রাজস্থানে। রাজস্থানের মরুভূমিতে যুদ্ধকৌশলের একটি ম্যানুয়েল তৈরি করেন তিনি, যা খুবই কার্যকর ছিল। ঐ যুদ্ধের পর কয়েক দফা পদোন্নতি পেয়ে ১৯৬৯ সালে ভারতের পূর্বাঞ্চলিয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ পান মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব। এ সময় নিজের জন্মস্থানে এসে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন তিনি। কলকাতায় কর্মস্থল ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গঙ্গা নদীর দৃশ্য দেখে খুবই মুগ্ধ হতেন। সেই সময় কি ভাবতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর হিসেবে আবির্ভূত হবেন তিনি? একদা যার পূর্বপুরুষ বাগদাদ থেকে ব্যবসা করতে ভারতে এসেছিলেন, পরে সেই ভারতেই বাসস্থান গেড়েছিলেন, সেই ঘরের সন্তান জ্যাকব হবে একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাসের অংশ। সত্যি মানুষের জীবন কি বৈচিত্রময়। মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যে নিজেকে সমৃদ্ধ এবং পৃথিবীর ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারে জ্যাকব তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ, জ্যাকবকে দিল্লী তলব করেছিলেন। বৈঠকে জ্যাকব সেনাপ্রধানকে জানিয়ে দেন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে কোন প্রকার হঠকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। পূর্বাঞ্চলে সামরিক শক্তি পর্যাপ্ত নয় বলে এসময় তিনি মন্তব্য করেন। তাছাড়া বাংলাদেশে বর্ষাকালে নদীনালা, খালবিল, রাস্তা-ঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা সামরিক আক্রমণের জন্য উপযোগি নয়। বাংলাদেশের দামাল সন্তানরাই প্রথমে যুদ্ধ করবে। বিশ্বে ও সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা প্রচারিত হোক আগে, তারপর পাকিস্তানের কর্মপন্থার উপর নজর রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে আসামের সাথে চীনের সীমান্ত। শীতের মৌসুমে চীনা সীমান্তে তুষারপাত ঘটে। এ সময় চীন কোন ঝুঁকি নেবে না। চীনকে আটকাতে হলে নভেম্বর-ডিসেম্বরের আগে যুদ্ধের কোন সিদ্ধান্ত নয়। তাছাড়া শীতকালে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিষ্কার হবে, রাস্তায় সামরিক যানবাহন চলাচলের উপযোগি হবে। অর্থাৎ আমাকে প্রস্তুত হতে হলে পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন। সেনাপ্রধান জ্যাকবের কথা রেখেছিলেন।

> ওই সময় জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জে এফ আর জ্যাকবকে। ১৬ই ডিসেম্বর সেই আলোচনায় মিত্রবাহিনীর কাছে নিয়াজি ও রাও ফরমান আলী আত্মসমর্পণে গড়িমসি করলে জ্যাকব তাদের ৩০ মিনিট সময় দেন। একই সঙ্গে নিয়াজিকে আলাদা করে ভয় দেখিয়ে বলেন, এরপর পাকিস্তানি জেনারেলদের নিরাপত্তার কোন দায়িত্ব নেবেন না তিনি। এখানে জ্যাকব সামরিক কৌশল, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। জ্যাকব এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, নিয়াজিকে চাপে রাখলেও তিনি নিজে ছিলেন তার চেয়েও অধিক চাপে।

জ্যাকবের পরিকল্পনা সঠিক ছিল। নভেম্বরের মধ্যে আমাদের মুক্তিসেনারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ইউরোপ-আমেরিকায় সর্বত্র প্রচারিত হয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও খোদ আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এসে দাঁড়ায়। মার্কিন পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় পার্লামেন্টারিয়ান এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতে এসে স্বচক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়সমূহ অনুধাবন করেন। রাশিয়া ভারতের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করে। এতে চীন অনেকটাই দমে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি থেকে চীন দূরে সরে আসে। চীনা নীতির পরিবর্তন এবং মার্কিন নীতির দূরদর্শিতা সম্পর্কে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের কোন ধারণা ছিল না। তাছাড়া ভারতের প্রস্তুতি সম্পর্কেও পাকিস্তানের ধারণা ছিল অস্পষ্ট।

এ সময় মাথাগরম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি শহরে রাতের আঁধারে বিমান হামলা চালায়। তারিখটি ছিল ৩রা ডিসেম্বর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডেকে ঐ রাতেই পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। ভারত পূর্বাঞ্চলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ড তৈরি করে পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, ৩রা ডিসেম্বর বিনা উসকানিতে ভারত আক্রমণে পাকিস্তানের ভুল একটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বলে পাকিস্তান জাতিসংঘে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল। যেন যুদ্ধবিরতি ঘটে। যুদ্ধবিরতি হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়বে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জ্যাকব যুদ্ধের মাঠে পাকিস্তানি কূটকৌশলকে শক্ত হতে মোকাবিলা করেন। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সাথে নিয়ে অতি দ্রুত ঢাকার পথে পাড়ি

জমান। জেনারেল নিয়াজির কৌশল ছিল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে শক্তঘাঁটি তৈরি করে চীন ও মার্কিন সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত টিকে থাকা। জ্যাকব সেই সব ঘাঁটিসমূহ পাশ কাটিয়ে ঢাকা দখলের পথে ছিলেন। তিনি ১৬ তারিখ ঢাকায় প্রবেশ করেন।

ওই সময় জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জে এফ আর জ্যাকবকে। ১৬ই ডিসেম্বর সেই আলোচনায় মিত্রবাহিনীর কাছে নিয়াজি ও রাও ফরমান আলী আত্মসমর্পণে গড়িমসি করলে জ্যাকব তাদের ৩০ মিনিট সময় দেন। একই সঙ্গে নিয়াজিকে আলাদা করে ভয় দেখিয়ে বলেন, এরপর পাকিস্তানি জেনারেলদের নিরাপত্তার কোন দায়িত্ব নেবেন না তিনি। এখানে জ্যাকব সামরিক কৌশল, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। জ্যাকব এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, নিয়াজিকে চাপে রাখলেও তিনি নিজে ছিলেন তার চেয়েও অধিক চাপে। কারণ সেই সময় ঢাকায় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২৬ হাজার পাকিস্তানি সৈনিক ছিল। অপর দিকে মাত্র ৩ হাজার ভারতীয় সৈন্য ও কয়েক শত মুক্তিবাহিনী ঢাকার পথে। তখনো তারা ঢাকা থেকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থান করছে। অস্থিরতার এই সময়ে জ্যাকব নিজে ধৈর্যশীল থেকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। নির্ধারিত ৩০ মিনিট পার হয়ে গেলে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আবার জ্যাকব যোগাযোগ করেন। এ সময় নিয়াজী আত্মসমর্পণে রাজি বলে জানিয়ে দেন।

নিয়াজি যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে থাকতেন তবে ইতিহাসই বলতো এর পরিণতি কী হতো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়তো আরো প্রলম্বিত হতো। আরো রক্তক্ষরণ হতো। আরো নারী ধর্ষিতা হতেন। জ্যাকবের মাথায় আরো একটি বিষয় ছিলো জাতিসংঘ, যদি জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন পরপর তিনবার ভেটো দিয়েছে, এরপর যদি যুদ্ধবিরতি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না হয়। পাকিস্তান যদি এ যুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে নিয়ে যায় এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সপ্তম নৌ-বহর থেকে আক্রমণ চালায়, তবে সর্বনাশ।

জ্যাকবের কাছে অনেকগুলো যদি ছিল, এসবের উত্তর খুঁজছিলেন তিনি। মেধাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন তিনি। জ্যাকবের যুদ্ধদিনের বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্মতা, সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিতা এবং বাঙালি ও বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা আমাদের গৌরবময় বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

জ্যাকব আজ ভারত ও বাংলাদেশে বীর হিসেবে চিহ্নিত। তাঁকে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ বীরের মর্যাদা দিয়েছেন। মুজিব বর্ষে বিজয়ের এই গৌরবোজ্জ্বল মাসে জ্যাকবকে আবারও স্যালুট।
জয় বাংলা।

লেখক, সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা

বঙ্গজননী (উপন্যাস)॥ কাজী সাইফুল ইসলাম॥ প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৭॥

প্রচ্ছদ: আদিত্য অন্তর॥ প্রকাশক: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা॥

‘বঙ্গজননী’ আত্মকথনের ভঙ্গিতে চমৎকার উপন্যাস

সৈকত হাবিব

যে কোনো জাতির দুঃসময় অতিক্রম করার জন্য বহু ধরনের দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তি, সাধনা ও প্রেরণার দরকার হয়। এগুলোর সুষম সম্মিলন ঘটলেই সম্ভব হয় জাতীয় মুক্তি কিংবা জাতি তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

বিশ শতকের বাঙালির রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকালে এর স্বরূপ টের পাওয়া যায়। বিশেষত তৎকালীন পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে আজকের দিনের তুলনা করলে খুব আশ্চর্য হতে হয়, কী অসাধ্য সাধনের ভেতর দিয়ে এ জাতিকে পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গেই গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের অবদানকে। টুঙ্গিপাড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের ভিতরে বঙ্গবন্ধুর ক্রমান্বয়ে জাতির জনক হয়ে ওঠা এবং নেপথ্যে থেকে তাঁর হয়ে ওঠার জন্য যাঁর কল্যাণময়ী হাত সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে, তিনি নিঃসন্দেহে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। যিনি রেণু নামেই মহিমান্বিত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের কাছে।

আর কী আশ্চর্য, তিনি তাঁর নামের মতোই পরাগ বা পুষ্পরেণু হয়ে স্বামী-সংসার-সন্তানদের জীবন আর স্বদেশকে প্রস্ফুটিত করেছেন কিন্তু নিজে কখনো পুষ্প হয়ে সৌরভ ছড়াতে চাননি। সারা জীবন আড়ালে থেকেই নিজের আরাধ্য কাজ করে গেছেন।

আমাদের আলোচ্য বই ‘বঙ্গজননী’তে এবার নিজের সমস্ত কথা ছড়িয়ে দিলেন তিনি। লেখক কাজী সাইফুল ইসলাম তাঁর এ উপন্যাসে রেণুর জবানিতেই আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর জীবন আর বাংলার জীবনের নানা জানা-অজানা গল্প। লেখকের মুন্সিয়ানা এবং শ্রমকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। কেননা, বইটি পড়তে শুরু করার পর থেকেই মনে হলো কোনো উপন্যাস নয়, বঙ্গজননীর সত্যিকারের আত্মজীবনীই যেন পড়ছি। তাঁর শৈশব থেকে ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঘটনাগুলো যেভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক তাতেই এই বিভ্রম তৈরি হয়েছে। তবে হয়তো উত্তম-পুরুষে সুকোমল ভাষায় এই কাহিনি-বর্ণনাকে মাধ্যম হিসেবে নিয়ে লেখক যথার্থই সাধু কাজ করেছেন, যার ফলে সুখপাঠ্যভাবে পুরো জাতির ইতিহাসকেই পাঠ করে ফেলা যায়। আর যে মানুষটি তাঁর জাতির জন্য সবচে মহিমান্বিত ভূমিকা পালন করেছেন, জীবনসঙ্গী শেখ মুজিবের শৈশব-কৈশোর-বেড়ে ওঠাসহ বহু ব্যক্তিগত জিনিসও আমরা সহজেই জেনে উঠতে পারি।

প্রসঙ্গত, নতুনদের জন্য, তথ্য হিসেবে জানিয়ে রাখা দরকার, সম্পর্কে বেগম মুজিব ছিলেন বঙ্গবন্ধুর চাচাতো বোন। তাঁর বয়স যখন তিন বছর তখন বাবা আর পাঁচ বছর বয়সে মা মারা যান। তারপর থেকে বঙ্গবন্ধুর মা-ই তাঁকে সন্তানস্নেহে লালন-পালন করেন। পরে পরিবারের ইচ্ছেয় তাঁদের মধ্যে বিয়ে হয়। আর তা ছিল যথার্থই বাল্যবিবাহ কিন্তু এমন সফল বিয়ে বাস্তবে হয়তো খুবই বিরল। এমনকি তাঁদের এই আমৃত্যু-বন্ধন এত প্রগাঢ় ছিল যে, বঙ্গবন্ধুর শত্রুরা তাঁর বহু কুৎসা রটনা করলেও তাঁর চরিত্র নিয়ে কখনো রাজনীতি করার সাহস করেছে বলে শোনা যায়নি!

তাঁদের যুগল জীবনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধু ধরে রেখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে: “আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স তের বছর হতে পারে।”... “রেণুর দাদা আমার দাদার চাচাত ভাই। রেণুর বাবা মানে আমার শ্বশুর ও চাচা তার বাবার সামনেই মারা যান। মুসলিম আইন অনুযায়ী রেণু তার সম্পত্তি পায় না। রেণুর কোনো চাচা না থাকায় তার দাদা (শেখ কাশেম) নাতনি ফজিলাতুন্নেছা ও তার বোন জিন্নাতুন্নেছার নামে সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান।”... “রেণুর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, ‘তোমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার এই নাতনির বিবাহ দিতে হবে।’ রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা; মুরব্বির হুকুম মানার জন্য রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। রেণু তখন কিছু বুঝত না, কেননা তার বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে।”

তাঁদের বিয়ে হয় ১৯৩৩ সালে, কিন্তু ফুলশয্যা হয় ১৯৪২ সালে। আর এইভাবে শুরু হয়েছিল তাঁদের কণ্টকিত যুগল-জীবনযাত্রা। কারণ বঙ্গবন্ধু তো শৈশব থেকেই রাজনীতির মানুষ আর বাল্যসখীও এটা কেবল সহজভাবে মেনেই নিলেন না, বরং সবচে অন্তরঙ্গ সহযোগীতে পরিণত হলেন। বঙ্গবন্ধুই

বলছেন সে কথা: "আব্বা-আম্মা ছাড়াও সময় সময় রেণুও আমাকে কিছু টাকা দিতে পারত। রেণু যা কিছু জোগাড় করত বাড়ি গেলে এবং দরকার হলেই আমাকে দিত। কোনোদিন আপত্তি করে নাই, নিজে মোটেই খরচ করত না। গ্রামের বাড়িতে থাকত, আমার জন্য রাখত।" একদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলছেন: "আব্বা, মা, ভাই-বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধ হয় অনেক কষ্টে বন্ধ রেখেছে। তবে এবারে একটু অনুযোগের স্বরে বললেন, 'একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না, এবার কলেজ ছুটি হলে বাড়ি এসো।'" এছাড়া একটি মজার ঘটনাও উল্লেখ করেছেন: হঠাৎ একদিন "রেণু কলকাতায় এসে হাজির, কেননা রেণুর ধারণা পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব, বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।"

খুব বিস্ময় জাগে, যখন ভাবি বাংলার এক প্রান্তিক গ্রামে বেড়ে ওঠা, শৈশবেই বাবা-মা হারা, স্কুল না-পেরোনো এক বালিকা নিজেকে প্রায় আড়ালে রেখে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে দিলেন একজন জাতির জনককে, তাঁর ছোট্ট গৃহকোণটিকে করে তুললেন সেই নেতার স্বর্গ-আশ্রয় ও জাতির কেন্দ্রস্থল। আর বঙ্গবন্ধুকে বললেন কোনোভাবেই পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপোশ না করতে এবং ৭ মার্চে বাঙালির সবচে সৌরভময় দিনে পণ্ডিতদের সুলিখিত কোনো বক্তৃতা নয়, বরং বললেন তাঁর অন্তরের গান জাতিকে শোনাতে! এমনকি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি নিজে থেকেই বললেন, তাঁকেও মেরে ফেলতে। কেননা এই মানুষটির সঙ্গেই যে তাঁর জন্মমৃত্যুর বন্ধন!

এইভাবে ক্রমাগত আত্মত্যাগই যেন তাঁর জীবন। আসলে বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁর জীবনটাও ছিল তাড়া-খাওয়া। কারণ পাক সামরিক শাসকরা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই বারবার আটক করেনি, বরং তাঁর পরিবারের উপরও চালিয়েছে জুলুম–বাড়ি থেকে ছোট বাচ্চাকাচ্চাসহ বের করে দেওয়া, টাকা-পয়সা বাজেয়াপ্ত করাসহ বহু ধরনের হয়রানি আর আর্থিক-মানসিক নির্যাতন! এটা চলেছে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বারবার, যেহেতু এ সময়ে বিভিন্ন কারণে বঙ্গবন্ধুকে কিছুদিন পর পর কারাবরণ করতে হয়েছে।

এই যখন অবস্থা তখন কীভাবে সবকিছু সামলেছেন তিনি শোনা যাক তাঁর বড় মেয়ে শেখ হাসিনার মুখেই: "একটার পর একটা ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু আমার মাকে কখনও ভেঙে পড়তে দেখিনি। কখনও, যত কষ্টই হোক, আমার বাবাকে বলেননি যে, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও বা চলে আস বা সংসার কর বা সংসারের খরচ দাও। কখনও না। সংসারটা কীভাবে চলবে সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজে করতেন। কোনোদিন জীবনে কোনো প্রয়োজনে বাবাকে বিরক্ত করেননি। মেয়েদের অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকে স্বামীদের কাছ থেকে পাবার। শাড়ি, গহনা, বাড়ি, গাড়ি, কত কিছু! এত কষ্ট তিনি করেছেন জীবনে; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেননি। চাননি। ১৯৫৪ সালের পরও বারবার কিন্তু বাবাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি আবার মন্ত্রী হন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন করে জয়ী হন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমরা ১৫ নম্বর আবদুল গণি রোডে এসে উঠি। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে। আর আমি দেখেছি বাবাকে যে, তিনি সংগঠন শক্তিশালী করবার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। কোনো সাধারণ নারী যদি হতেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতেন, স্বামী মন্ত্রিত্ব কেন ছেড়ে দিচ্ছেন। এই যে বাড়ি-গাড়ি এগুলো সব হারাবেন, এটা কখনও হয়তো মেনে নিতেন না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হতো, অনুযোগ হতো। কিন্তু আমার মাকে দেখিনি এ ব্যাপারে একটা কথাও তিনি বলেছেন। বরং আব্বা যে পদক্ষেপ নিতেন সেটাই সমর্থন করতেন।"

বরং স্বামী শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুকে পাঠানো চিঠিতে: "আপনি শুধু আমার স্বামী হওয়ার জন্য জন্ম নেননি, দেশের কাজ করার জন্যও জন্ম নিয়েছেন। দেশের কাজই আপনার সবচাইতে বড় কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার কাজে যান। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আল্লাহর উপরে আমার ভার ছেড়ে দিন।"

নিজের স্বামী-সংসারকে কেন্দ্রে রেখেও যিনি জাতির জন্য নিজের সবচে প্রিয়জনের সঙ্গ-সান্নিধ্যও কামনা করেন না, সেই মানুষটি তো যথার্থই জাতির জননী। 'বঙ্গজননী' উপন্যাসেও তাই ব্যক্তিগত-পারিবারিক কথার চেয়েও বেশি এসেছে জাতির দুর্যোগ-দুঃখ-বেদনার কথা; ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল পর্যন্ত ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা।

১৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে মোট ১৯টি অধ্যায়ে বিষয়ানুগ শিরোনামসমেত কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক, যা বহন করছে তাঁর শ্রমশীলতা ও সৃজনশীলতার চিহ্ন।

তবে এত অবদানের পরও বেগম মুজিবকে বলা যায় 'ইতিহাসে উপেক্ষিতা'। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভালোমন্দ প্রচুর কাজ হলেও তাঁকে ঘিরে কাজ খুব কমই হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে নীলিমা ইব্রাহিমের একক বইটিই যেন স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া তাঁকে ঘিরে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা ছোটদের জীবনী রচিত হলেও অবদানের তুলনায় সেগুলো নগণ্য। প্রতিশ্রুতিশীল লেখক কাজী সাইফুল ইসলাম দরদ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে সেই শূন্যতাকে খানিকটে হলেও পূর্ণ করলেন। তাকে অভিবাদন।

কবি ও গবেষক

শেকড় থেকে শিখরে ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস

আলাউল হোসেন

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ আর পেলাম এক মহানায়ককে। যিনি তাঁর প্রজ্ঞা, চিন্তা-চেতনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে তুলে আনলেন 'শেকড় থেকে শিখরে'।

একাত্তরের মহান বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে ভাস্কর্য। তেমনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও তৈরি হয়েছে নানা শিল্পকর্ম। তবে বঙ্গবন্ধু ও বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে পাবনার বেড়ায় নির্মিত 'শেকড় থেকে শিখরে' ভাস্কর্যটি অনেক দিক থেকে ব্যতিক্রম। ১০ ফুট উচ্চতার কংক্রিটের স্তম্ভের উপর নির্মাণ করা হয়েছে ১৮ ফুট উচ্চতার বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য। এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। বাংলাদেশে স্টেইনলেস স্টিলে তৈরি এটিই বঙ্গবন্ধুর সর্ববৃহৎ আবক্ষ ভাস্কর্য। এই আবক্ষ ভাস্কর্যের দু পাশে রয়েছে তিনটি করে অতিরিক্ত স্তম্ভ। যাতে সিমেন্ট কেটে অঙ্কিত হয়েছে '৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উত্থান-পতন এবং উন্নয়নের ধারা। মূল ভাস্কর্যের এক পাশে ২৬টি কলামের একটি সীমানা বেষ্টনী রয়েছে, যার প্রত্যেকটি কলামে টাইলসে এনগ্রেভিং করা হয়েছে বাংলার ইতিহাস। যেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সিরাজউদ্দৌলা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের সচিত্র ইতিহাস।

বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের পথে সমগ্র জাতির সঙ্গে একই কাতারে পাবনার বেড়া অঞ্চলের হাজারো মানুষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাস সনাক্ত করে উপজেলার ডাববাগান যুদ্ধই একাত্তরে প্রথম সংঘটিত সম্মুখযুদ্ধ। এ কারণেই পাবনা জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসংবলিত উল্লেখযোগ্য একটি স্থাপনা এলাকাবাসীর প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছিল। তাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অমর স্মৃতি জাগরিত করে রাখার উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনসহ নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলার সঠিক ইতিহাস সদা উদ্ভাসিত রাখার প্রয়াসে এ ধরনের একটি স্থাপনা নির্মাণ সময়োচিত সিদ্ধান্ত। শিল্পী বিপ্লব দত্ত এর নকশা প্রণয়ন করেন এবং প্রায় দেড় বছর নিরলস পরিশ্রমের পর নির্মাণ করেন বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এ ভাস্কর্য। ২০১৬ সালে এটি পাবনার বেড়া উপজেলার নগরবাড়ি ঘাটের অদূরে নাটিয়াবাড়িতে নগরবাড়ি-পাবনা মহাসড়ক সংলগ্ন ধোবাখোলা করোনেশন স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান ফটকের পাশে স্থাপিত হয়।

ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার আজিজুল হক আরজু বলেন, নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভাস্কর বিপ্লব দত্ত বলেন, "বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন করে জন্ম নেয়া একটি স্বাধীন দেশ। এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে ভাষার জন্য। অস্তিত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির জন্য সংগ্রাম করেছে। নতুন প্রজন্ম এ সংগ্রাম দেখেনি। বই পড়ে ও বড়দের কাছে গল্প শুনে মনের ভেতরে একটা আবছা ছবি তৈরি করেছে স্বাধীনতা নিয়ে। তাই বাংলার সঠিক ইতিহাস ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে তুলে ধরাই এ ভাস্কর্যের মূল থিম। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার চেতনাকে প্রবাহিত করা এবং চোখের সামনে বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই আমি আমার সর্বোচ্চ শ্রমটুকু দিয়েছি এর নির্মাণ কাজে। তাছাড়া নিজের এলাকায় কাজটি করতে পেরেও আমি গর্ববোধ করি।"

শিক্ষক ও সাংবাদিক

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নোমান রবিন

টেকস্ট বইয়ের ইতিহাসে আর অডিও-ভিজ্যুয়ালে তুলে ধরা ইতিহাসের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ইতিহাসবিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে ঠিকই, কিন্তু সেই ইতিহাসের দৃশ্যায়ন করতে হলে চাই দক্ষ, কল্পনাশক্তিপ্রবণ ব্যক্তি। যিনি জানেন কিভাবে শব্দ, কণ্ঠ নিয়ে দৃশ্য তৈরি করতে হয়, জানেন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার। সময়কে ধরতে বা বুঝতে চাই ঐ সময়ের ব্যবহৃত বস্তু, পোষাক, স্থাপনা, শিল্পকর্ম কিংবা আসবাবপত্র। সংরক্ষণ করা আমাদের ধাতে নেই। তাই অনেক কিছুই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতিহাস কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে ইতিহাসে হয়েছে পরিবর্তন। আর এরকম নানান সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতার জন্য সঠিকভাবে ইতিহাস দৃশ্যকল্পে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও গত কয়েক যুগ ধরে ব্যক্তিগতভাবে চলছে ইতিহাসকে ভিডিওতে তুলে ধরার জোর প্রচেষ্টা।

সেরকম একটি উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেন আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র নির্মাতা ও ইতিহাসনির্ভর তথ্যচিত্রের পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফিরোজ। আমি সেই বিরল যাত্রার একজন বলিষ্ঠ সহযোদ্ধা ছিলাম। ফিরোজ ভাই তাঁর জ্ঞানের সবটুকু অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাঝে। শিখিয়েছেন ইতিহাসকে দৃশ্যকল্পে তুলে ধরার টেকনিক। পরবর্তী প্রায় ৩ বছর (২০১৪ থেকে ২০১৭) আমরা নিরলসভাবে মগ্ন থেকে সৃষ্টি করেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত সুবিশাল তথ্যচিত্র "দ্য অলটাইম হিরো" বা "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী"। যা আজও পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত সবচেয়ে বৃহৎ, তথ্যবহুল ও প্রযুক্তিনির্ভর তথ্যচিত্র। এই অসাধারণ কর্মযজ্ঞের অনেক কথা না বলাই থেকে যাবে। আগেই বলে রাখি, ইংরেজি ভাষায় নির্মিত এই তথ্যচিত্রটি অনলাইনে মুক্তি দেবার পর সুশীল সমাজের মধ্যে ব্যাপক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমরা সকল প্রতিবাদ ও লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে গেছি। ফিরোজ ভাই তখন লন্ডনে, ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করছেন। যদিও তিনি সেই যুদ্ধে হেরে গেলেন।

হাজার বছর শব্দটি উচ্চারণ করলেই একটি জনপদের হাজার বছরের ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, অর্থশাস্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতি মনে ভেসে ওঠে। বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। এ ব্যাপারে লিখিত অনেক দলিল আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই শ্রেষ্ঠত্বের কোন অডিও-ভিজ্যুয়াল নির্মিত হয়নি। নতুন প্রজন্ম এই বিষয়ে অন্ধকারে। বঙ্গবন্ধুর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল তো দূরের কথা তাঁর

ভাবনা, গবেষণা, প্রযোজনা: সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফিরোজ (ছবিতে বামে) চিত্রনাট্য ও নির্মাণ: নোমান রবিন

তথ্যচিত্র, ব্যাপ্তিকাল: ১০০ মিনিট, নির্মাণকাল: ২০১৪ - ২০১৭

সুবিশাল সংগ্রামী জীবনের পুরো গল্প তরুণ, যুবা, কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের কাছে অজানা। যতটুকু জানে তাও অস্পষ্ট, বিভিন্ন দিবস বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জানা।

অনেক বিষয়। বঙ্গবন্ধুর শিশুকাল, কৈশোর, কলকাতার জীবন, দেশভাগের ব্যাথা, আওয়ামী লীগের জন্মের শুরুর কথা। কীভাবে, কেন পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে গেল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। কীভাবে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন আওয়ামী লীগের প্রধান। ১৯৫৪এ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। সরকার গঠন, মন্ত্রীত্ব, মন্ত্রীত্বকালীন তাঁর অবদান, পরবর্তী সময়ের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও আইনপ্রণেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে তাঁর দেশ ও বিদেশ ভ্রমণ; আদর্শ, উদ্দেশ্য, উপদেশ ও কথোপকথন। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ চলা, ধর্মজ্ঞান অর্জন। আপামর জনসাধারণের হৃদয় জয় করার কারিশমা। মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার নানা গল্প আছে এই বায়োগ্রাফিতে। আছে পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ। বাবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে কিভাবে একটি পরিবারের সন্তানেরা নিজেদের শখ, আহ্লাদ ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিল। কীভাবে একটি পরিবার দেশের ভাগ্যকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতার পথে হেঁটে চলল। গোপালগঞ্জ মহকুমা থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ ছেলে মুজিব কর্তৃক শক্তিশালী ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী। সাধারণ ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে গদি থেকে কীভাবে টেনে হিঁচড়ে নামালেন, হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, জেলজুলুম ও হুলিয়া। ১৯৬৯এর গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০এর নির্বাচন, ফলাফল। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। ২৫ মার্চের কালো রাতের বিস্তারিত তথ্য। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা। ৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো নয় মাস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি। দেশে প্রত্যাবর্তন। অতঃপর দেশ পুনর্গঠন ও বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণ। দেশের ভেতরে ও বাহিরে ষড়যন্ত্র। আভ্যন্তরীণ কোন্দল। দুর্নীতি কারা করেছে, কেন করেছে, কীভাবে করেছে, কারা সহযোগিতা করেছে। কেন বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন আনলেন। দেশবান্ধব ও সমাজবান্ধব রাজনৈতিক সমীকরণ করলেন। অতঃপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। কেন হল, কীভাবে হল, কারা এর সাথে জড়িত। নীল নকশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইত্যাদি হাজারো বিষয় নিয়ে নির্মিত হয়েছে "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী" তথ্যচিত্রটি। একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী টাইটেলের মঞ্চে (এনিমেটেড ৭ই মার্চের মঞ্চ) আমরা পূর্ববর্তী সংগ্রামী যোদ্ধাদের (সুভাষ, তিতুমীর, সূর্যসেনসহ আরও অনেকে) বঙ্গবন্ধুর সাথে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়েছি। সবার মুখে জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়েছে সেই মঞ্চ। তারা প্রত্যেকে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাদের অবদান সমাজ, রাষ্ট্র তথা সময়ের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেই বিষয়টিকে ভিন্ন চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু ফিরোজ ভাই পুরো ব্যাপারটিকে ইতিহাসের চশমা দিয়ে দেখেছিলেন।

সময়কে সাক্ষী রেখে, কালকে সাথে নিয়ে, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা ও গুজবকে উড়িয়ে দিয়ে সাহসের সাথে তৈরি হয়েছে "দ্য অল টাইম হিরো" বা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী"।

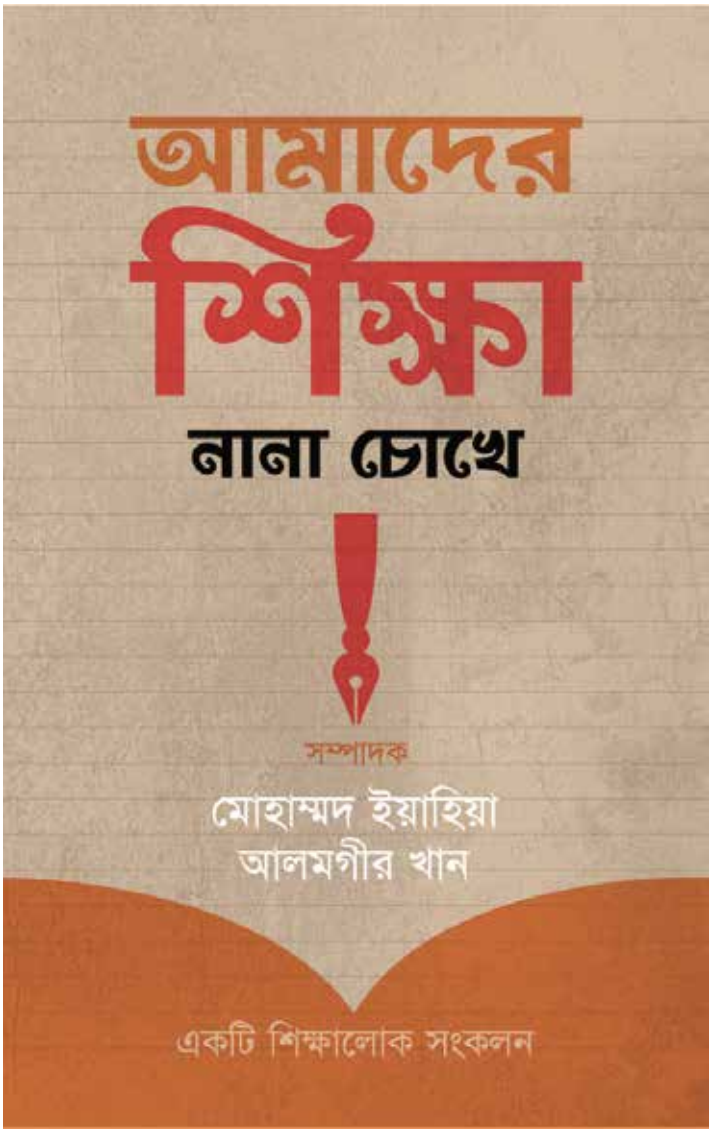
আমাদের
শিক্ষা
নানা চোখে
!
সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
আলমগীর খান
একটি শিক্ষালোক সংকলন

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর
কেউ রবে না নিরক্ষর

Shikkhalok (a CDIP education bulletin), 8th year 1st issue, December 2020 - March 2021